কোরআনের পরিচয়

নূর হোসেন মজিদী

কোরআনের পরিচয়
নূর হোসেন মজিদী

اسم کتاب :   کُرأنِر پاریچای (شناخت قرآن)
نویسنده:نورحسین مجیدی
زبان نوشته: بنگالی.

Kor'aner Porichoy (Knowing Qur'an) by Nur Hosain Majidi, written in Bengali.

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

ভূমিকা

কোরআনের পরিচয়

'আক্বলী দলীলের প্রয়োজনীয়তা

কোরআন মজীদ : একমাত্র অবিকৃত ঐশী কিতাব্

পূর্ববর্তী নবীদের ('আঃ) পক্ষে কোরআনের সাক্ষ্যের যুক্তি গ্রহণযোগ্য কি?

কোরআন মজীদের ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতা

কোরআন মজীদের বিকৃতিহীনতা

কোরআনের মুতাওয়াতির্ হওয়া প্রশ্নে সংশয় উপস্থাপন

মুছ্বহাফে 'উছমান্ চাপিয়ে দেয়ায় বিকৃতির সন্দেহ

নোকতাহ্ ও ই'রাব্ সংযোজন মানে কি পরিবর্তন?

'বিসমিল্লাহ্' পাঠ নিয়ে বিতর্ক

কতক কপিতে শব্দগত পার্থক্যের অভিযোগ

ক্বিরাআতে বিভিন্নতার প্রশ্ন

মতপার্থক্য যখন অকাট্যতার প্রমাণ

একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের হারাকাত্ প্রশ্নে মতপার্থক্য প্রসঙ্গে

শেষ নবী (ছ্বাঃ) ও কোরআন মজীদের অপরিহার্যতা

দু'টি ভিত্তিহীন অভিযোগ

কোরআনে স্ববিরোধিতা থাকার অভিযোগ

কোরআন মজীদে নাসেখ্ ও মানসূখ্

কোরআন মজীদের বিধিবিধানে স্ববিরোধিতার অভিযোগ

নাসেখ্-মানসূখের ভিত্তি ও প্রকরণ

আয়াত্ ও আহকামের নাসখের সম্ভাব্যতা

কোরআনের আয়াত্ মানসূখ্ হওয়া সম্ভব কি?

কথিত পরস্পরবিরোধী আহকাম্

১) মদ সংক্রান্ত হুকুম

২) মীরাছ্ সংক্রান্ত বিধান ও ওয়াছ্বীয়াত্

৩) ব্যভিচার ও অশ্লীলতার শাস্তি

কোরআনের মু‘জিযাহ্

কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

এক : রোমের বিজয়

দুই : আবূ লাহাবের স্ত্রীর মৃত্যুকালীন অবস্থা

তিন : মক্কাহ্ বিজয়

চার : ফির্‘আউনের মৃতদেহ সংরক্ষণ

পাঁচ : রাসূলুল্লাহ্‌র (ছ্বাঃ) বংশধারা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

কোরআন মজীদে বৈজ্ঞানিক তথ্য

এক : উদ্ভিদের প্রাণ

দুই : জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

তিন : মাতৃগর্ভে সন্তানের বিকাশপ্রক্রিয়া

চার : পৃথিবীর গতিশীলতা

পাঁচ : পরাগায়ণ ও বৃষ্টিবর্ষণে বায়ুর ভূমিকা

ছয় : পানি থেকে প্রাণের উৎপত্তি

সাত : নভোমণ্ডল গ্যাসীয় ছিল

আট : আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী একত্র ছিলো

কোরআন : কাছে থেকে জানা

কোরআন ও নুযূলে কোরআন

বিরাজমান ভুল ধারণা

ভুল ধারণার কারণ

বিচারবুদ্ধির রায়

অস্তিত্বের প্রকারভেদ

কোরআনের স্বরূপ

বাণী এক : প্রকাশে স্তরভেদ

দুই পর্যায়ের নাযিল্

কোরআন নাযিলের ধরন

কোরআনের ভাষাগত রূপ আল্লাহর

নুযূলের আরো পর্যায়

সাত যাহের্ ও সাত বাত্বেন্

প্রসঙ্গ : শা’নে নুযূল্

পরিশিষ্ট:

কোরআন কারো কাছে ঋণী নয়

সহায়ক তথ্যসূত্র :

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহীম্।

এ এক অনস্বীকার্য সত্য যে, কোরআন মজীদ ছাড়া অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থকেই ঐতিহাসিকভাবে প্রামাণ্য পদ্ধতিতে প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, যে সব ব্যক্তির নামে তা চালু আছে তা তাঁদের কাছ থেকে এসেছে। তেমনি ঐ সব ব্যক্তি যে নবী ছিলেন এটাও অকাট্যভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ, ঐ সব ব্যক্তির ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ঐতিহাসিকভাবে প্রামাণ্য পদ্ধতিতে অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায় না এবং তাঁদের জীবনেতিহাস ও ঐ সব গ্রন্থের বিকৃত হওয়ার বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত সত্য। একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব এবং কোরআন মজীদকে যে একটি ঐশী গ্রন্থ হিসেবে দাবী করে তিনিই রেখে গিয়েছেন, আর এ গ্রন্থটি যে তিনি যেভাবে রেখে গিয়েছেন ঠিক সেভাবেই অবিকৃত রয়ে গেছে এটাও ঐতিহাসিকভাবে প্রামাণ্য পদ্ধতিতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

বলা বাহুল্য যে, অমুসলিমরা রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত নবী হিসেবে স্বীকার করে না, ফলতঃ স্বাভাবিকভাবেই তারা কোরআন মজীদকে আল্লাহর কিতাব্ বলেও স্বীকার করে না, বরং এটিকে তাঁর রচিত গ্রন্থ বলে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু এ গ্রন্থটিকে যে তিনিই ঐশী গ্রন্থ হিসেবে দাবী করে পেশ করেছেন এবং তিনি যেভাবে রেখে গিয়েছেন হুবহু সেভাবেই অবিকৃতভাবে বর্তমান আছে তা আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে যে কোনো নিরপেক্ষ জ্ঞানগবেষকই স্বীকার করতে বাধ্য।

অবশ্য হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে আল্লাহর মনোনীত নবী হিসেবে গণ্যকারী মুসলমানদের জন্য কোরআন মজীদকে আল্লাহর কিতাব্ হিসেবে গণ্য করা একটি স্বাভাবিক বিষয় এবং এটি যে সংরক্ষিত তথা

অবিকৃত আছে তা মেনে নেয়ার জন্য তাদের কাছে স্বয়ং কোরআন মজীদের দাবীই যথেষ্ট। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন যে, তিনিই এ গ্রন্থ নাযিল্ করেছেন এবং তিনিই এর সংরক্ষণকারী। মুসলমানদের জন্য কেবল এতোটুকু জানাই যথেষ্ট – যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন মজীদ অবিকৃতরূপে আমাদের কাছে পৌঁছার জন্য অন্য কারো কাছেই ঋণী নয়।

তবে অবিকৃত বিচারবুদ্ধি ও মুক্ত চিন্তার অধিকারী অমুসলিমদের কাছে কোরআন মজীদের প্রামাণ্যতা ও বিকৃতিহীনতা সম্পর্কে এতোটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, এ গ্রন্থটি অল্প অল্প করে দীর্ঘ তেইশ বছরে নাযিল্ হয়েছে এবং নাযিল্ হওয়ার সাথে সাথেই তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আর রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর বহু সংখ্যক ছ্বাহাবী (সহচর) সাথে সাথে এবং পরে তাঁদের কাছ থেকে শুনে আরো অসংখ্য ছ্বাহাবী তা মুখস্ত করেছেন। এভাবে তা বিকৃতির আশঙ্কা থেকে সংরক্ষিত থেকেছে। তাই সকল যুগেই সমগ্র মানবজাতির মধ্যে কোরআন মজীদের একটিমাত্র সংস্করণ বিদ্যমান ছিলো এবং রয়েছে।

বস্তুতঃ কোরআন মজীদের অন্যতম প্রধান পরিচয় হচ্ছে এই যে, এটি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে প্রদত্ত স্থায়ী মু'জিযাহ্ অর্থাৎ তিনি যে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত নবী ছিলেন তার প্রমাণ বহনকারী অবিনশ্বর অলৌকিক নিদর্শন যা এ বিশ্বজগত ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত প্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় মানবকুলের সামনে দেদীপ্যমান হয়ে বিরাজমান থাকবে।

কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্ (অলৌকিকতা)র বিভিন্ন দিক আছে। এ সব দিকের মধ্যে সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে এর ভাষার বিস্ময়কর প্রাঞ্জলতা ও প্রকাশক্ষমতার সূক্ষ্মতা সহকারে সংক্ষিপ্ত আয়তনে সীমাহীন জ্ঞানগর্ভতা ও বিষয়বস্তুর ব্যাপক বৈচিত্র্য। এ সব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কোরআন মজীদ তার বিরোধীদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে যে, তাদের পক্ষে সম্ভব হলে সবাই মিলে অন্ততঃ এর একটি ছোট সূরাহর সম মানের একটি সূরাহ্ রচনা করে নিয়ে আসুক। আজ পর্যন্ত এ চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করে

নি। এছাড়া কোরআন মজীদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে; এটাও এর ঐশী গ্রন্থ হওয়ার আরেকটি প্রমাণ।

যা-ই হোক, মুসলমানরা কোরআন মজীদকে আল্লাহর কিতাব্ বলেই জানে এবং প্রতিটি মুসলিম পরিবারেই কোরআন মজীদের কপি রয়েছে, আর তারা সকলেই কম-বেশী কোরআন তেলাওয়াত্ করে এবং এ গ্রন্থকে সম্মান ও যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করে। এমতাবস্থায় তাদের সামনে কোরআন মজীদকে নতুন করে পরিচিত করিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। হয়তোবা এ কারণেই অন্ততঃ বাংলা ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে ছোট-বড় হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হলেও কোরআন মজীদের পরিচয় সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে অন্ততঃ অত্র গ্রন্থকারের জানা নেই।

কোরআন মজীদের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব কেবল এটিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে ও একে জীবনের নিত্যসঙ্গী করলে। অবশ্য সে নিত্যসঙ্গী হতে হবে সবাক তথা পদে পদে পথনির্দেশ প্রদানকারী, বোবা নিত্যসঙ্গী নয়। এ কথা এ কারণে বলছি যে, অধিকাংশ মুসলমানই কোরআন মজীদকে সযত্নে সংরক্ষণ করে এবং তেলাওয়াত করে বটে, তবে জানে না যে, তাতে কী বলা হয়েছে, আর তা জানে না বলেই তা মানা সম্ভব নয়, ফলতঃ এর অবস্থা হচ্ছে বোবা সঙ্গীর ন্যায় যার উচ্চারিত শব্দাবলী থেকে পথনির্দেশ পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, এমনটা হওয়ার কারণ কী? কোরআন মজীদের সাথে অন্ততঃ শিক্ষিত লোকদের এহেন আচরণ বিস্ময়ের সৃষ্টি না করে পারে না। এ আচরণ হচ্ছে দূর থেকে আগত এমন কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়ের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের ন্যায় – যার সম্পর্কে কেবল এতোটুকু জানা আছে যে, তিনি আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন মুরুব্বী, কিন্তু তাঁর যোগ্যতা ও গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা নেই। ফলে আমরা অনেক সময় কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাতের কাছে পাওয়া হাতুড়ে ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়ে জীবন বিসর্জন দেই, অথচ ঘরে বেড়াতে আসা ঐ শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী হয়তো

ঐ রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, কিন্তু তা জানা ছিলো না বলে তাঁর কাছে সাহায্য চাই নি।

অবশ্য কোরআন মজীদকে এরূপ কোনো ডাক্তারের সাথে এমনকি সর্বরোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে তুলনা করা হলেও তা হবে দুর্বল উপমা (مثال ناقص), কারণ, মানব প্রজাতির জন্য এমন কোনো সমস্যা ও জিজ্ঞাস্য নেই এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভব হবে না – যার সমাধান ও জবাব কোরআন মজীদে নেই। কারণ, কোরআন মজীদ নিজের অন্যতম পরিচয় দিয়েছে 'সকল কিছুর বর্ণনা বা জ্ঞান' (تبيانا لكل شيء) বলে।

কোরআন মজীদের সাথে আমাদের এ আচরণের কারণ হচ্ছে আমরা এর ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পরিচয়ের সাথেও পরিচিত নই। এ কারণেই আমরা একে তেলাওয়াত করাই যথেষ্ট মনে করি, একে অনবরত 'অধ্যয়ন' করি না এবং এর কাছ থেকে সবাক নিত্যসঙ্গীর ন্যায় পদে পদে পথনির্দেশ গ্রহণ করি না। আফসোস্, আমাদের ওলামায়ে কেরাম এবং ইসলাম চর্চাকারীগণও শত শত ইসলামী গ্রন্থ অধ্যয়ন বা মানুষের রচিত হাজার হাজার পৃষ্ঠা আয়তনের বহু ফিকবহী গ্রন্থ বা তাফসীর অধ্যয়ন এবং ক্ষেত্রবিশেষে হাজার হাজার হাদীছ মুখস্ত করা ও সে জন্য গর্ব অনুভব করা সত্ত্বেও সরাসরি পুরো কোরআন মজীদ থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করতে জানেন না, এমনকি অনেকেই তা শুধু মূল ভাষায় পাঠ করে তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম নন। অথচ এটি হচ্ছে মানুষের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত সর্বশেষ গ্রন্থ এবং মুসলমানদের জন্য নাযিলকৃত একমাত্র গ্রন্থ – যে কারণে তিনি এ গ্রন্থে "হে মানবকুল!" বলে বার বার সম্বোধন করে এটির মূলমর্ম [তাওহীদ, আখেরাত্ ও নবুওয়াতে মুহাম্মাদী (ছ্বাঃ)-এর সত্যতা] মেনে নেয়ার জন্য সকল মানুষের প্রতি এবং আরো অনেক বেশী বার "হে ঈমানদারগণ!" বলে সম্বোধন করে এটি থেকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে পথনির্দেশ গ্রহণের জন্য ঈমানদারদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা কোরআন মজীদের সাথে কী আচরণ করছি? এ কারণেই, আমরা কোরআন মজীদকে সসম্মানে ও সশ্রদ্ধভাবে সর্বোচ্চ ও পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখা সত্ত্বেও এবং তেলাওয়াতের আগে-পরে যে কোনো সময় তাতে চুম্বন করে ও তাতে বুকে লাগিয়ে তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা সত্ত্বেও হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) ক্বিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন; তিনি বলবেন :

يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.

"হে আমার রব! অবশ্যই আমার লোকেরা এই কোরআনকে অপরিচিত-অবজ্ঞাত ও বর্জিত করে রেখেছিলো।" (সূরাহ্ আল্-ফুরক্বান্ : ৩০)

অবশ্য বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের উদ্দেশ্য কোরআন মজীদ থেকে মুসলমানদেরকে কী কী বিষয়ে পথনির্দেশ নিতে হবে তা উল্লেখ করা নয়। কারণ, আগেই উল্লেখ করেছি যে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানব প্রজাতির জীবনে এমন কোনো সমস্যা ও প্রশ্ন নেই ও উদ্ভব হবে না যার সমাধান ও জবাব কোরআন মজীদে নেই। সুতরাং এ ধরনের বিষয়বস্তুর পরিচয় তুলে ধরতে গেলে তা হবে এক বিশাল গ্রন্থ। কিন্তু এরূপ কোনো গ্রন্থ রচিত হলেও তা রচনার পরবর্তী কালে আরো বহু সমস্যা ও প্রশ্নের উদ্ভব হবে এবং সে সব সমস্যা ও প্রশ্নের সমাধান ও জবাবের জন্য সরাসরি কোরআনের কাছেই যেতে হবে; কোরআনের পরিচয়মূলক এ ধরনের গ্রন্থ কখনোই সরাসরি কোরআন থেকে পথনির্দেশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থেকে আমাদেরকে বেনিয়ায করবে না।

বরং বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কোরআন মজীদ সম্পর্কে বিদ্যমান কতক ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন – যে সব ভ্রান্ত ধারণার কারণে আমরা কোরআন মজীদকে বর্জিত করে রেখেছি, যদিও পুরো কোরআন মজীদের সাধারণ ও সুগভীর তাৎপর্য সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন না করলেও অন্ততঃ এর বাহ্যিক সাধারণ তাৎপর্য সরাসরি এ গ্রন্থ থেকে

জেনে নেয়া প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরয। কারণ, এ গ্রন্থে প্রতিটি মুসলমানকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মূলতঃ একটি পর্যালোচনামূলক গ্রন্থ – যাতে কেবল সর্বজনজ্ঞাত ও মশহূর তথ্যগুলো উল্লেখ করে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ কারণে, সূত্রভারাক্রান্ততা এড়ানো ও আয়তনকে সীমিত রাখার লক্ষ্যে কোরআন মজীদের সূরাহ্ ও আয়াত নম্বর ছাড়া ঐতিহাসিক তথ্যসমূহের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্থানে স্বতন্ত্রভাবে তথ্যসূত্রনির্দেশ করা হয় নি। অবশ্য গ্রন্থের শেষে সাধারণভাবে সহায়ক সূত্রসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া মূল গ্রন্থে যে সব ব্যাখ্যামূলক পাদটীকা রয়েছে ইউনিকোডে রূপান্তরের পর সেগুলোকে মূল পাঠের ভিতরে সমন্বিত বা তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

অত্র গ্রন্থের প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি খৃস্টীয় বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তৈরী করা হয়েছিলো এবং পরে তা কম্পিউটার-কম্পোজও করা হয়েছিলো। একটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তা ২০০৪ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশের কথা ছিলো। কিন্তু প্রধানতঃ আর্থিক সমস্যার কারণে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। এর কয়েক বছর পর সংশ্লিষ্ট কম্পিউটারটির হার্ড ডিস্ক্ ক্র্যাশ্ হয়ে যাওয়ায় গ্রন্থটির কম্পোজ পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে এর সর্বশেষ প্রুফ্ কপিটি রক্ষা পেয়েছিলো।

যেহেতু এ ধরনের গ্রন্থের জন্য প্রকাশক পাওয়া দুরূহ ব্যাপার এবং স্বয়ং গ্রন্থকারেরও তা প্রকাশ করার মতো আর্থিক সামর্থ্য হয়ে উঠে নি, সেহেতু এটি এতো বছর যাবত এভাবেই ছিলো। অবশেষে, প্রধানতঃ ফেসবুকের পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে পরিবেশনের লক্ষ্যে এটি নতুন করে কম্পোজে হাত দেই। কারণ, অন্ততঃ একজন পাঠক বা পাঠিকাও যদি এর বক্তব্য অধ্যয়ন করেন ও তা থেকে কোরআন মজীদের সঠিক পরিচয় লাভ করেন তাহলেও আমার শ্রম-সাধনা সার্থক হবে বলে মনে করি। অবশ্য নতুন করে কম্পোজ করার কারণে

স্বাভাবিকভাবেই পুরো গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে কিছুটা সংযোজন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, অত্র গ্রন্থকারের প্রণীত *কোরআনের মু'জিযাহ্* শিরোনামের আরো একটি গ্রন্থ রয়েছে – যার আয়তন অত্র গ্রন্থের আয়তনের তুলনায় মোটামুটি দ্বিগুণ।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। তা হচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই অত্র গ্রন্থে কোরআন মজীদের বেশ কিছু আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে এবং এ সব আয়াতের মধ্যে এমন আয়াতও রয়েছে যাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য উত্তম পুরুষে বহুবচন অর্থাৎ 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তৎকালীন আরবী বাকরীতিতে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশালীদের মুখে নিজের জন্য এক বচন অর্থেই 'আমরা' ব্যবহারের প্রচলন ছিলো, এ কারণে তৎকালীন আরবের মোশরেকরা কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য 'আমরা' ব্যবহার করায় এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে নি তথা একে বহু ঈশ্বরবাদের সপক্ষে প্রমাণ বলে দাবী করে নি। কিন্তু যদিও বাংলা সহ আরো অনেক ভাষায় সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব বা বিনয় প্রকাশের জন্য এর প্রচলন রয়েছে তথাপি বাংলা বাকরীতিতে অনেক ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিনয়স্বরূপ 'আমরা' এবং কর্তৃত্বভাব প্রকাশের জন্য 'আমি' ব্যবহারেরও প্রচলন আছে। এ কারণে বাংলা ভাষায় আল্লাহ্ তা'আলার জন্য 'আমরা' ব্যবহার বেখাপ্পা শুনায় বিধায় আমরা এক বচনে এর অনুবাদ করেছি। অত্র গ্রন্থে এ ধরনের সকল আয়াতের ক্ষেত্রেই আমরা এ রীতি অনুসরণ করেছি।

আরেকটি কথা উল্লেখ করতে চাই এই যে, অমার অন্যান্য গ্রন্থ ও লেখার ন্যায় অত্র গ্রন্থেও যে সব আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সে সবের বেলায় বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের বোধগম্যতা ব্যাহতকরণ ব্যতীতই মূল আরবী-ফার্সী উচ্চারণ প্রতিফলিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে আমি পুনরায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে, যারা বা যে সব প্রতিষ্ঠান সচেতনভাবেই হোক বা

অসচেতনতার কারণেই হোক বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ করে এ সব শব্দকে মূল বানান ও উচ্চারণ থেকে অধিকতর দূরে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন আমি তাঁদের সে মত ও প্রচেষ্টার বিরোধী, বরং নীতিগতভাবে, ভাষার ওপর প্রতিষ্ঠানিক হস্তক্ষেপের বিরোধী। এর বিপরীতে আমি মনে করি, ভাষাকে খরস্রোতা নদীর ন্যায় প্রাকৃতিকভাবে মুক্ত-স্বাধীন থেকে স্বীয় গতিপথ বেছে নিয়ে চলতে দেয়া উচিত।

ভূমিকার সমাপ্তি পর্যায়ে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। তা হচ্ছে, আমার কনিষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠা কন্যা অত্র গ্রন্থের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ কম্পোজ করে দিয়েছে। নচেৎ এ গ্রন্থের পুনঃকম্পোজের কাজ এতো তাড়াতাড়ি সমাপ্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। আমি এ জন্য তাদের কাছে শুকরিয়া জানাচ্ছি এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাদের এ খেদমতের জন্য শুভ প্রতিদান প্রদানের আবেদন জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ তা'আলা অত্র গ্রন্থকে এর পাঠক-পাঠিকাদের জন্য মহাগ্রন্থ কোরআন মজীদের সঠিক পরিচয় জানার ক্ষেত্রে সহায়ক করে দিন, কোরআন মজীদ সম্পর্কে আমাদের মন-মস্তিষ্কে বিরাজমান ভ্রান্ত ধারণাসমূহের পর্দাগুলো অপসারিত করে দিন এবং পুরো কোরআন মজীদের তাৎপর্য সরাসরি ও সঠিকভাবে জানার জন্য আমাদেরকে আগ্রহী করে দিন ও তাওফীক্ব দান করুন। ফলতঃ অত্র গ্রন্থকে এর লেখক এবং প্রচার-প্রসারে সহায়তাকারী ও পাঠক-পাঠিকাদের জন্য ইহকালে হেদায়াতের সহায়ক ও পরকালে মুক্তির পাথেয় করে দিন। আমীন।

নূর হোসেন মজিদী

ঢাকা
২৮শে রাবী'উল্ আউয়াল ১৪৩৬
৭ই মাঘ ১৪২১
২০শে জানুয়ারী ২০১৫।

কোরআনের পরিচয়

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

"নিঃসন্দেহে এ কোরআন সেদিকেই পথপ্রদর্শন করে যা সর্বাধিক সুপ্রতিষ্ঠিত।" (সূরাহ্ আল্-ইসরা'/ বানী ইসরাঈল্ : ৯)

কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব্ – এটাই তো কোরআনের পরিচয়। তবে এ হচ্ছে কোরআন মজীদের সংক্ষিপ্ততম সাধারণ পরিচয়। আর এর বিশেষ পরিচয় হচ্ছে কোরআন মজীদের পরিপূর্ণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও এর বিষয়বস্তু তথা এতে নিহিত জ্ঞানের পরিধি সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারণা। কিন্তু এর সংক্ষিপ্ততম সাধারণ পরিচয় অর্থাৎ কোরআন মজীদ যে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব্ – এ পরিচয় কেবল মুসলমানদের নিকটই গ্রহণযোগ্য; অমুসলমানরা এটা মানে না, আর এটাই স্বাভাবিক।

অমুসলমানদের মধ্যকার অনেক জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত-গবেষক কোরআন মজীদের সীমাহীন জ্ঞানভাণ্ডার হবার কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু এটি যে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ সে কথা স্বীকার করেন নি। তাঁরা রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে মানবজাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাঁর উত্তম নৈতিক চরিত্র, আচার-আচরণ ও গুণাবলী, যোগ্যতা, সাফল্য ও অগাধ জ্ঞানের কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে মনোনীত নবী হিসেবে তাঁকে স্বীকার করেন নি। তাঁরা তাঁকে মানবজাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন

এবং কোরআন মজীদকে তাঁর রচিত গ্রন্থ হিসেবে অভিহিত করে এ গ্রন্থকেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। এভাবে তাঁদের সমস্ত প্রশংসা লোকদেরকে সে উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে নিয়ে যাওয়ার কাজে সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যে উদ্দেশ্যে তাঁকে নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছিলো এবং কোরআন মজীদ নাযিল্ হয়েছিলো। অথচ কী দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানদের অন্ততঃ একটি শিক্ষিত অংশকে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) ও কোরআন মজীদকে প্রদত্ত ঐ সব অমুসলিম জ্ঞানী-গুণীর সার্টিফিকেট্ সোৎসাহে প্রচার করতে দেখা যাচ্ছে।

এমতাবস্থায়, যে উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের জন্য হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)কে নবী হিসেবে পাঠানো হয় এবং কোরআন মজীদ নাযিল্ হয় সে উদ্দেশ্য-লক্ষ্য হাছ্বিলের জন্য কোরআন মজীদ যে আল্লাহর কিতাব্ এবং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) এ কিতাব্ যে অবস্থায় রেখে গিয়েছেন ঠিক সে অবস্থায়ই যে কোনো ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি ও পরিবর্তন তথা বিকৃতি থেকে সংরক্ষিতভাবে বিদ্যমান আছে তা প্রমাণ করা অপরিহার্য। আর এটা প্রমাণ করা মানে কোরআনের বিকৃতিহীনতা প্রশ্নে মুসলমানদের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অন্ধ বিশ্বাস নয়। বরং এ জন্য সর্বজনগ্রহণযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা যারূরী; এমন প্রমাণ চাই কোরআন মজীদের আল্লাহর কিতাব্ হওয়ার দাবী প্রত্যাখ্যানকারীদের পক্ষে যা খণ্ডন করা সম্ভব হবে না, তেমনি মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত যে সব ভ্রান্ত ধারণা কোরআনের অবিকৃত থাকার সত্যতাকে দুর্বল করে ফেলে এবং কোরআন-বিরোধীদের দ্বারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলোরও অবসান ঘটাবে। আর কেবল তখনই কোরআনের সঠিক পরিচয় জানা সম্ভব হবে।

সুতরাং প্রথমে এ বিষয়টি সমগ্র মানবজাতির কাছে সমভাবে গ্রহণযোগ্য বিচারবুদ্ধিজাত (‘আকল্লী) দলীল দ্বারা প্রমাণ করতে হবে এবং এর পরে কোরআন মজীদের পরিচিতির অন্যান্য দিকের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

'আক্বলী দলীলের প্রয়োজনীয়তা

কেউ কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে, অমুসলিমরা কোরআন মজীদ সম্বন্ধে কী ভাবছে তাতে আমাদের কিছুই আসে-যায় না; আমরা কোরআন মজীদকে আল্লাহ্‌র কিতাব্ বলে জানি – এটাই যথেষ্ট। এমনকি অনেক মুসলমান তো যুক্তিতর্কের আশ্রয়গ্রহণ তথা বিচারবুদ্ধির প্রয়োগকে দস্তুর মতো ভয় পান। তাঁরা মনে করেন যে, বিচারবুদ্ধির দ্বারস্থ হলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তিনটি কারণে তাঁদের এ মত গ্রহণযোগ্য নয় :

প্রথমতঃ অন্ধ বিশ্বাসের নাম ঈমান নয়, বরং দ্বীনের মৌলিকতম উপস্থাপনাগুলো (উছূলে দ্বীন্) সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধির ফয়সালায় উপনীত হওয়ার এবং তা স্বীকার করার নামই ঈমান। অবশ্য এ হচ্ছে ঈমানের সূচনাবিন্দু, নচেৎ এ ঈমানের মৌলিক দাবী পূরণ তথা মৌলিক আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং পরিকল্পিতভাবে ও ঔদ্ধত্যের সাথে তা লঙ্ঘন না করা ঈমানের অপরিহার্য দিক। অর্থাৎ ন্যূনতম শর্তাবলী সহকারে তাওহীদ, আখেরাত্ ও নবুওয়াতে মুহাম্মাদী (ছ্বাঃ)কে অন্তরে সত্য জানা, মুখে প্রকাশ ও তদনুযায়ী চলার নামই ঈমান। [এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয় এবং অত্র গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের জন্য তা অপরিহার্যও নয়।]

অন্যান্য ধর্ম অন্ধ বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই বিচারবুদ্ধির মোকাবিলা করতে তাদের বড় ভয়। ইসলাম এ ধরনের অন্ধত্বের তথা দ্বীনের ক্ষেত্রে বাপ-দাদাদের অনুসরণে কতক ধারণার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস পোষণ ও পূর্ববর্তী ধর্মনেতাদের অন্ধ অনুসরণের কঠোর সমালোচনা করেছে। যারা বিচারবুদ্ধির বিপরীতে অন্ধ বিশ্বাসের অনুসরণ করে কোরআন মজীদ বার বার তাদেরকে তিরস্কার করেছে। বার বার এরশাদ হয়েছে : افلا تعقلون؟ – "অতঃপর তোমরা কি বিচারবুদ্ধি কাজে লাগাবে না?"

শুধু তা-ই নয়, যারা বিচারবুদ্ধি কাজে লাগায় না কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে তারা মানুষ পদবাচ্য নয়। আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের সম্পর্কে এরশাদ করেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ.

“নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই মূক-বধির গোষ্ঠী – যারা বিচারবুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।” (সূরাহ্ আল্-আনফাল্ : ২২)

অতএব, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের বিরোধিতা করা মানে এ সব আয়াতের বিরোধিতা করা।

দ্বিতীয়তঃ বিচারবুদ্ধির কাছে আবেদন জানানো না হলে কেউই ইসলাম গ্রহণ করতো না; সবাই নিজ নিজ ধর্মের অন্ধ বিশ্বাসের ওপর টিকে থাকতো, রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর আহবানে সাড়া দিতো না। ফলে আমরা যে এখন জন্মসূত্রে মুসলমান, সে সৌভাগ্য আমাদের হতো না। অমুসলমানরা কোরআন মজীদ সম্বন্ধে ভুল ধারণা নিয়ে বসে থাকবে, অথচ আমরা তা খণ্ডন করবো না – এমন অভিমত স্বয়ং কোরআন মজীদের উদ্দেশ্যেরই পরিপন্থী। তাই মুসলমানদের জন্য অমুসলিমদের কাছে কোরআন মজীদের পরিচয় সহ ইসলামের উছূলে দ্বীনকে বিচারবুদ্ধির আলোকে পেশ করা অপরিহার্য কর্তব্য; এভাবেই আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাহদের সামনে তাঁর হুজ্জাত্ পূর্ণ করে দিতে হবে।

উল্লেখ্য, হুজ্জাত্ পূর্ণ করা (اتمام حجة) মানে কোনো প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রয়োজনীয় যুক্তি-প্রমাণ সহকারে এমনভাবে তুলে ধরা যে, তা যেন তার পাঠক বা দর্শক-শ্রোতার কাছে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় এবং ঐ বিষয়ে তার অন্তরে কোনোই সন্দেহ অবশিষ্ট থাকার অবকাশ না থাকে, তা সে প্রকাশ্যে এর সত্যতা স্বীকার করুক বা না-ই করুক।

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

“অতঃপর যার ইচ্ছা ঈমান আনয়ন করুক, আর যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক।” (সূরাহ্ আল্-কাহফ্ : ২৯)

আর বলা বাহুল্য যে, তা করতে হলে স্বয়ং মুসলমানদেরকে তা বিচারবুদ্ধির আলোকে জানতে হবে।

তৃতীয়তঃ বর্তমানে সারা বিশ্বে, বিশেষ করে বাংলাদেশে পাশ্চাত্যের ক্রুসেডারদের অর্থনৈতিক সাহায্যপুষ্ট ও সেখানকার সরকারগুলোর রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত খৃস্টান মিশনারীরা ও ইসলাম-বিরোধী বহু এনজিও ইসলামের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত আক্রমণাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের উছূলে দ্বীন সম্বন্ধে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে তারা কোরআন মজীদকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। তাই মুসলমানদেরকে ঈমান রক্ষা করতে হলে ইসলামের উছূলে দ্বীনকে বিচারবুদ্ধির আলোকে নতুন করে জানতে হবে এবং মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের সামনে নতুন করে পেশ করতে হবে। বিশেষ করে কোরআন মজীদ যে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বশেষ, পূর্ণাঙ্গ ও সুরক্ষাপ্রাপ্ত একমাত্র গ্রন্থ তা বিচারবুদ্ধির দলীল দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণ করা অপরিহার্য।

কোরআন মজীদ : একমাত্র অবিকৃত ঐশী কিতাব্

আসমানী কিতাবকে কেন্দ্র করে যে সব ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে সে সব ধর্মের অনুসারীরা নবুওয়াত্ ও আসমানী কিতাবের ধারণায় বিশ্বাসী। ইয়াহূদী ধর্ম, খৃস্ট ধর্ম ও যরথুস্ত্রী ধর্ম এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত - ইসলাম যাদেরকে আহ্লে কিতাব্ অর্থাৎ আসমানী কিতাবধারী বলে উল্লেখ করেছে। এমনকি হিন্দু ধর্মের মতো পৌত্তলিক ধর্মও অবতারবাদে বিশ্বাস করে - যা সম্ভবতঃ নবুওয়াতের ধারণারই বিকৃত রূপ। হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থ গীতা-কে শ্রীকৃষ্ণের - তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যিনি তিন শীর্ষদেবতার অন্যতম বিষ্ণুর মানবীয় রূপ - বাণী বলে বিশ্বাস করে। অন্য কথায়, গীতা হিন্দুদের নিকট ঐশী গ্রন্থ স্বরূপ।

[এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গীতা যার বাণী সেই শ্রীকৃষ্ণ ও গোপ জাতির উপাখ্যানের শ্রীকৃষ্ণ যে অভিন্ন ব্যক্তি নয় এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই; দীর্ঘ কালের প্রবাহে উভয়কে অভিন্ন গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু গীতা-র শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব ও জীবনেতিহাস অকাট্য ঐতিহাসিক সূত্রে ও প্রত্যয় সৃষ্টিকারীরূপে প্রমাণ করা সম্ভব না হলেও গীতা যার বাণী তিনি যে অত্যন্ত উঁচু স্তরের বাগ্মী ও ধর্মজ্ঞানী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে গীতায় বিকৃতি প্রবেশ ও গীতা-র বক্তা শ্রীকৃষ্ণের জীবনেতিহাস হারিয়ে যাওয়ার কারণে তিনি নবী ছিলেন কিনা তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব না হলেও উপাখ্যানের শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁকে অভিন্ন গণ্য করে তাঁর প্রতি কটাক্ষ করা কোনো মুসলমানের

জন্য ঠিক হবে না। বরং সতর্কতার নীতি অনুযায়ী তাঁর সম্পর্কে নীরব থাকা বাঞ্ছনীয়।]

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও তাদের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক-কে গৌতম বুদ্ধের উপদেশবাণী বলে বিশ্বাস করে।

কিন্তু ঐশী কিতাব্ হবার দাবীদার গ্রন্থাবলীর মধ্যে একমাত্র কোরআন মজীদ ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থকেই আজ ঐশী কিতাব্ হিসেবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ :

(১) যে সব ব্যক্তির নামের সাথে এ সব গ্রন্থকে সম্পৃক্ত করা হয় ঐ সব নামে আদৌ কেউ ছিলেন কিনা তা ঐতিহাসিক সূত্র থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ, কোনো ঐতিহাসিক পরম্পরাই প্রত্যয় (يقين) সৃষ্টিকারীরূপে কথিত সময় ও ব্যক্তিদের পর্যন্ত পৌঁছে না।

(২) যদি যুক্তির খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে, এ নামের ব্যক্তিগণের অস্তিত্ব ছিলো তথাপি তাঁরা যে নবী বা তথাকথিত অবতার বা ঐশী প্রেরণার অধিকারী মহাপুরুষ ছিলেন তা প্রত্যয় সৃষ্টিকারীরূপে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ, তাঁদের জীবনকাহিনী, আচার-আচরণ ও অলৌকিক কাজকর্ম (মু'জিযাহ্) ঐতিহাসিক সূত্রে ও প্রত্যয়সৃষ্টিকারী পরম্পরায় আমাদের কাছে পৌঁছে নি।

বিশেষ করে মু'জিযাহ্ বা অলৌকিক কর্মের বৈশিষ্ট্যই এমন যা কেবল প্রত্যক্ষকারীদের জন্যই পূর্ণ মাত্রায় প্রত্যয়সৃষ্টিকারী হয়ে থাকে। এমনকি কথিত কোনো মু'জিযাহ্ বা অলৌকিক কাজ প্রত্যক্ষকারী নয় এমন সমকালীন লোকদের জন্যও তা প্রত্যক্ষকারীদের কাছ থেকে শোনার পরেও প্রত্যক্ষকারীদের প্রত্যয়ের অনুরূপ প্রত্যয় সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ, এরূপ বর্ণনার ওপর প্রত্যয়ের বিষয়টি তা প্রত্যক্ষ করার দাবীদারদের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে শ্রোতাদের প্রত্যয়ের ওপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় মুতাওয়াতির্ বা প্রতি স্তরে ব্যাপকভিত্তিক অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় বর্ণনার অকাট্য দলীল-প্রমাণ ছাড়া এরূপ দাবী

পরবর্তীকালীন লোকদের জন্য প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারে না। এমনকি মুতাওয়াতির্ বর্ণনা থেকে তা পাঠকারী বা শ্রবণকারীদের মধ্যে প্রত্যয় সৃষ্টি হলেও তা প্রত্যক্ষকারীদের প্রত্যয়ের সমমাত্রায় হয় না এবং অনেকের মধ্যে আদৌ প্রত্যয় সৃষ্টি না-ও হতে পারে।

(৩) যদি যুক্তির খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে, কথিত ব্যক্তিবর্গের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ছিলো এবং তাঁরা নবী, ঐশী প্রেরণার অধিকারী মহাপুরুষ বা তথাকথিত অবতার ছিলেন তথাপি এটা প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, ঐ সব গ্রন্থ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল্ হয়েছিলো। কারণ, ঐ সব গ্রন্থে এমন সব বক্তব্য রয়েছে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সব গ্রন্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল্ হয় নি; অন্ততঃ যেভাবে ঐ সব গ্রন্থ বিদ্যমান সেভাবে নাযিল্ হয় নি। এ সব গ্রন্থ পাঠ করলেই সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, এগুলো সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আগত নয়, বরং মানুষের রচিত গ্রন্থ। শুধু তা-ই নয়, এ সব গ্রন্থ যাদের ওপর নাযিল্ হয়েছিলো বলে অনেকে মনে করেন, এগুলো তাঁদের নিজেদের রচিতও নয়। বরং এ সব গ্রন্থের বাচনভঙ্গি প্রমাণ করে যে, এগুলো ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ রূপে পরবর্তীকালে রচিত।

বাইবেলের 'পুরাতন নিয়ম' অংশের প্রথম পাঁচ পুস্তককে 'তাওরাত্" বলে দাবী করা হয়। কিন্তু এর প্রথম দুই পুস্তক - 'আদি পুস্তক/ সৃষ্টি পুস্তক' ও 'যাত্রা পুস্তক' - পুরোপুরি ইতিহাসগ্রন্থ; বিশেষতঃ 'যাত্রা পুস্তক' হযরত মূসা ('আঃ)-এর জীবনী বিষয়ক পুস্তক।

বাইবেলের 'নতুন নিয়ম' অংশের প্রথম চার পুস্তককে 'ইনজীল্' বলে দাবী করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা চারজন ভিন্ন ভিন্ন লেখকের লেখা হযরত 'ঈসা ('আঃ)-এর জীবনকাহিনী মাত্র। 'মথি' পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে হযরত 'ঈসা ('আঃ)-এর বংশের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ বংশবর্ণনাটি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত 'ঈসা ('আঃ)-এর নিকট ওয়াহীরূপে নাযিল্ হয়েছিলো বলে কি কোনো বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব? নাকি স্বয়ং খৃস্টানরা

এরূপ বিশ্বাস করে? তেমনি গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুরু হবার পূর্বে যুদ্ধক্ষেত্রে দুই পক্ষের সৈন্যসমাবেশের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাকে কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বাণী বলে মেনে নেয়া চলে? নাকি স্বয়ং হিন্দুরাও এরূপ বিশ্বাস করে?

(৪) ঐ সব গ্রন্থের কোনোটিই মূল ভাষায় বর্তমান নেই এবং ক্ষেত্রবিশেষে, মূল ভাষার গ্রন্থ পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়ার কারণে অন্য ভাষার অনুবাদ থেকে মূল ভাষায় পুনরায় অনূদিত হয়েছে।

এ সব গ্রন্থে সংঘটিত বিকৃতি (অর্থাৎ সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ও অংশবিশেষ হারিয়ে যাওয়া) একটি অকাট্য সত্য – যা শুসংশ্লিষ্ট ধর্মের অনুসারী পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন। এ কারণে এ ধরনের প্রতিটি গ্রন্থেরই বিভিন্ন সংস্করণ আছে এবং এ সব সংস্করণের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য ও পরস্পরবিরোধিতা বিদ্যমান। ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের 'পুরাতন নিয়ম' আলাদা এবং খৃস্টানদের 'বাইবেল্' (পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম)-এর বিভিন্ন সংস্করণ রয়েছে, যেমন : রোম্যান ক্যাথলিক বাইবেল্, এ্যাপোক্রাইফা বাইবেল্, অর্থোডক্স্ বাইবেল্ ইত্যাদি।

'নতুন নিয়ম্'-এর শুরুতে যে চারটি পুস্তক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে – যেগুলোকে 'ইনজীল্' (সুসমাচার) নামে অভিহিত করা হয় খৃস্টান্ পণ্ডিত ও ধর্মনেতাগণ বলছেন না যে, এগুলোর মধ্য থেকে কোনটি প্রকৃত ইনজীল্? নাকি এগুলোর মধ্য থেকে একটিও সঠিক নয়? কারণ, একাধিক তো সঠিক হতে পারে না। যদি একটি পুস্তক সঠিক হয়ে থাকে তো বাকী তিনটিকে 'নতুন নিয়ম্'ভুক্ত করার কারণ কী?

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, ইনজীলের সংস্করণ মাত্র চারটিতে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর সংস্করণসংখ্যা (মুদ্রণসংখ্যা নয়) অনেক বেশী। ইনজীলের ৭৭টি সংস্করণের কথা লন্ডন্ থেকে ১৮১৩ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত 'এক্সিহোমো' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে এবং 'এন্সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা'র ত্রয়োদশ মুদ্রণের ২য় খণ্ডের ১৭৯-১৮০ পৃষ্ঠায় ২৫টি ইনজীলের (ইনজীলের ২৫টি সংস্করণের) নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ

তালিকার ৬নং নামটি হচ্ছে ‘বারনাবার ইনজীল্’ (Gospel of Barnabas)। হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)-এর নির্দেশে তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য বারনাবা কর্তৃক সংকলিত এ ইনজীলকে মোটামুটি ছ্বহীহ্ বলা চলে। কিন্তু এতে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর ‘মুহাম্মাদ্’ ও ‘আহ্মাদ্” নাম, আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক কেবল তাঁকে সৃষ্টির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্র হিসেবে এ বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করা এবং তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁর পরিচয় ও মর্যাদা উল্লেখ থাকায় খৃস্ট জগতে এ ইনজীল্ নিষিদ্ধ রয়েছে। (অবশ্য খৃস্টান ধর্মগুরুদের আরোপিত এ নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে খৃস্টীয় বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এটি ইংরেজী ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয় এবং তার ভিত্তিতে বিশ্বের আরো বহু ভাষায় এটি অনূদিত হয়।)

কোরআন মজীদ ব্যতীত ঐশী গ্রন্থ হিসেবে পরিচয়কৃত অন্যান্য গ্রন্থের প্রতটিরই যে কেবল বিভিন্ন সংস্করণ রয়েছে তা নয়, বরং ঐ সব গ্রন্থে এমন সব বক্তব্য রয়েছে যে কারণে ঐ সব গ্রন্থকে আদৌ ঐশী কিতাব্ বলা চলে না। বিশেষ করে বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে আল্লাহ্ তা‘আলা ও নবী-রাসূলগণ (‘আঃ) সম্পর্কে এমন সব জঘন্য অপবাদ দেয়া হয়েছে যা মুখে উচ্চারণ করা যায় না। এ গ্রন্থের বিভিন্ন পুস্তকে নবী-রাসূলগণের (‘আঃ) প্রতি মদপান, ব্যাভিচার, গণহত্যার নির্দেশ দান ইত্যাদি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। এ সব কথাকে যদি সত্য ও আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে নাযিল্কৃত বলে মানতে হয় তাহলে যাদের নামে ঐ সব পুস্তককে পরিচিত করা হয়েছে তাঁদেরকে নবী-রাসূল্ (‘আঃ) বলে গণ্য করা আদৌ সম্ভব নয়। অন্যদিকে তাঁদেরকে নবী-রাসূল্ (‘আঃ) বলে গণ্য করলে ঐ সব তথ্য যে মিথ্যা ও ঐশী গ্রন্থে অনুপ্রবিষ্ট তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বাইবেল্ নামে পরিচিত সকল গ্রন্থেই এ ধরনের বিকৃতি কম-বেশী ঘটেছে। হিন্দু ধর্মের সর্বপ্রধান গ্রন্থ ‘গীতা’য়ও প্রক্ষিপ্ত বা অনুপ্রবিষ্ট বক্তব্য রয়েছে বলে নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বঙ্কিম

চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বীকার করেছেন। অবশ্য তিনি না বললেও যে কেউ এ গ্রন্থটি পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন যে, এটি আদিতে যদি ঐশী বাণী থেকেও থাকে তথাপি এতে মানবরচিত বহু কথা অনুপ্রবেশ করেছে।

পূর্ববর্তী নবীদের (‘আঃ) পক্ষে কোরআনের সাক্ষ্যের যুক্তি গ্রহণযোগ্য কি?

বিশেষতঃ ইয়াহূদী ও খৃস্টান্ পণ্ডিতগণ হযরত মুহাম্মাদ্ (ছ্বাঃ)-এর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের (‘আঃ)– যাদেরকে তাঁরা নবী বলে মানেন – নবুওয়াত্, তাঁদের মু‘জিযাহ্ ও তাঁদের নামে প্রচলিত গ্রন্থাবলীর ঐশী গ্রন্থ হবার সত্যতার সপক্ষে কোরআন মজীদের সাক্ষ্য ও মুসলমানদের ঈমানের যুক্তি উপস্থাপন করে থাকেন।

এ পণ্ডিতগণ বলেন : “তোমরাই তো তাঁদেরকে নবী বলে স্বীকার করছো এবং এ-ও স্বীকার করছো যে, তাঁদের ওপর তাওরাত্, ইনজীল্, যাবূর্ ইত্যাদি ঐশী কিতাব্ নাযিল্ হয়েছিলো; আমরা-ও তা-ই স্বীকার করি। অতএব, তাঁদের নবী হওয়া ও তাওরাত্-ইনজীলের ঐশী কিতাব্ হওয়ার ব্যাপারে বিতর্ক নেই। কিন্তু আমরা মুহাম্মাদকে নবী ও কোরআনকে আল্লাহর কিতাব্ বলে মনে করি না। অতএব, আমরা যাদেরকে নবী মানি তাঁদের নবী হওয়ার বিষয়টি এবং আমরা যে সব কিতাবকে ঐশী কিতাব্ হিসেবে মানি সে সব কিতাবের ঐশী কিতাব্ হওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত ও সন্দেহাতীত, কিন্তু মুহাম্মাদের নবী হওয়া ও কোরআনের ঐশী কিতাব্ হওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত ও সন্দেহাতীত নয়।”

তাঁদের এ বিভ্রান্তিকর (fallacious) কূট যুক্তিতে অনেক সরলমনা ও দ্বীনী জ্ঞানে দক্ষতাহীন মুসলমান বিভ্রান্ত হয়।

ঐ সব ইয়াহূদী ও খৃস্টান্ পণ্ডিত আরো বলেন : “কোরআনে হযরত মূসা (‘আঃ)কে “কালীমুল্লাহ্” (আল্লাহর সাথে কথোপকথনকারী) এবং হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)কে “কালিমাতুল্লাহ্” (কালিমাতুম্ মিনহু – আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী বা তাঁর বাণীর জীবন্ত মূর্ত প্রতীক) বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে এরূপ মর্যাদা দেয়া হয় নি।

অতএব, তিনি যদি নবী হয়েও থাকেন তো হযরত মূসা (‘আঃ) ও হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)-এর মর্যাদা তাঁর ওপরে। তাই হযরত মূসা (‘আঃ) ও হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)-এর ধর্মেরই অনুসরণ করা উচিত, হযরত মুহাম্মাদের (ছ্বাঃ) ধর্মের নয়।”

তাঁদের এ ধরনের যুক্তি হচ্ছে এক ধরনের অপযুক্তি – যুক্তিবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে ভ্রমাত্মক অপযুক্তি (مغالطة – fallacy) বলা হয়। কারণ, মুসলমানরা যে অতীতের নবী-রাসূলগণকে (‘আঃ) নবী-রাসূল বলে গণ্য করে এবং তাঁদের ওপর তাওরাত্, যাবূর্, ইনজীল্ প্রভৃতি ঐশী গ্রন্থ নাযিল্ হয়েছিলো বলে স্বীকার করে, আর তাঁদের মু‘জিযাহ্ সমূহকে স্বীকার করে থাকে – তা ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের দাবী, ঐ সব নামে প্রচলিত গ্রন্থাবলীর বক্তব্য অথবা ঐ সব নামের ব্যক্তি ও গ্রন্থের ঐতিহাসিকভাবে প্রত্যয়সৃষ্টিকারী প্রামাণ্যতার কারণে নয়। বরং হযরত মুহাম্মাদ্ (ছ্বাঃ)কে নবী ও কোরআন মজীদকে আল্লাহর কিতাব্ বলে মানে বিধায় এবং কোরআন মজীদে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের (‘আঃ) ও তাঁদের ওপর নাযিল্কৃত ঐশী কিতাব্ সমূহের কথা উল্লেখ থাকার কারণেই মুসলমানরা তাঁদেরকে নবী-রাসূল্ (‘আঃ) বলে মনে করে এবং তাঁরা মু‘জিযাহ্ ও উল্লিখিত নামের বিভিন্ন ঐশী কিতাবের অধিকারী ছিলেন বলে প্রত্যয় পোষণ করে থাকে।

এখন হযরত মুহাম্মাদ্ (ছ্বাঃ) যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত নবী না হয়ে থাকেন এবং কোরআন মজীদ যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল্কৃত কিতাব্ না হয়ে হযরত মুহাম্মাদ্ (ছ্বাঃ)-এর নিজের রচিত গ্রন্থ হয়ে থাকে তাহলে কোরআন মজীদের উক্তির ভিত্তিতে ঐ সব নবী-রাসূলের (‘আঃ) ঐতিহাসিক অস্তিত্ব, নবুওয়াত্, মু‘জিযাহ্ ও তাঁদের নামে প্রচলিত কিতাব্ সমূহ ঐশী কিতাব্ বলে প্রমাণিত হয় না; এ সব ব্যাপারে কোরআন মজীদের সাক্ষ্য প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ, হযরত মুহাম্মাদ্ (ছ্বাঃ) যদি নবী না হয়েও নবী হবার মিথ্যা দাবী করে থাকেন এবং নিজের রচিত কিতাবকে আল্লাহর কিতাব্ বলে দাবী করে থাকেন (না‘উযু বিল্লাহি মিন্ ক্বাওলি যালিক্), তাহলে তাঁর ও তাঁর

উপস্থাপিত গ্রন্থের দেয়া সাক্ষ্য ও তথ্যের কোনোই গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে না।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, কেবল হযরত মুহাম্মাদ্ (ছ্বাঃ)-এর নবুওয়াতের ও কোরআন মজীদের ঐশী গ্রন্থ হবার ওপরে ঈমানই এতে উল্লিখিত নবী-রাসূলগণের (‘আঃ), তাঁদের প্রদর্শিত মু‘জিযাহ্ ও ঐ সব আসমানী কিতাবের আসমানী কিতাব্ হওয়া সংক্রান্ত তথ্যের ওপর ঈমান সৃষ্টি করে থাকে। অতএব, কারো অন্তরে যদি কোরআন মজীদের আল্লাহর কিতাব্ হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যয় সৃষ্টি হয় তাহলে তার জন্য কোরআন মজীদের সকল কথাকেই সত্য ও ঐশী প্রত্যাদেশ বলে জানা অপরিহার্য। সুতরাং কোরআন মজীদ আরো যা কিছু বলেছে তার জন্য তার সব কিছুর ওপর ঈমান পোষণ করা অপরিহার্য।

আর কোরআন মজীদ সাক্ষ্য দিয়েছে যে, ঐ সব নবী-রাসূলের (‘আঃ) কাছে যে সব আসমানী গ্রন্থ নাযিল্ হয়েছিলো তাঁদের পরে তাঁদের অনুসারী হবার দাবীদার লোকেরা সে সব গ্রন্থকে বিকৃত করেছে এবং সেগুলোর অংশষবিশেষকে লুকিয়ে ফেলেছে। এছাড়া কোরআন মজীদ হযরত মুহাম্মাদ্ (ছ্বাঃ)কে “রাহমাতাল্লিল্ ‘আলামীন্ – সমগ্র জগতবাসীর জন্য দয়া ও অনুগ্রহের মূর্ত রূপ” (সূরাহ্ আল্-আম্বিয়া’ : ১০৭) এবং “সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য রাসূল্” (সূরাহ্ আল্-আ‘রাফ্ : ১৫৮) হিসেবে ঘোষণা করে তাঁকে সকল নবী-রাসূলের (‘আঃ) ওপর মর্যাদা দিয়েছে। কোরআনের সাক্ষ্যকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে হলে এ সব বিষয়েও কোরআনের সাক্ষ্যকে মেনে নিতে হবে।

কোরআন মজীদের ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতা

ঐশী গ্রন্থ হিসেবে দাবীকৃত সকল গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র কোরআন মজীদেরই ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতা রয়েছে। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)ই যে ঐশী কিতাব্ হিসেবে দাবী করে এ কিতাব্ মানুষের সামনে পেশ করেছেন – এ বিষয়ে কোনোরূপ ঐতিহাসিক বিতর্ক বা সংশয় নেই।

যে সব (অমুসলিম) পণ্ডিত-গবেষক হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে আল্লাহর নবী বলে মনে করেন না, বরং বিরল প্রতিভাধর মহাজ্ঞানী বলে মনে করেন তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই কোরআন মজীদকে আল্লাহর কিতাব্ বলে মনে করেন না; তাঁরা এ মহাগ্রন্থকে স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) কর্তৃক রচিত বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই যে, বর্তমানে প্রচলিত কোরআন মজীদই হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর রেখে যাওয়া কিতাব্; এ কিতাব্ পরবর্তীকালে কেউ রচনা করে তাঁর ওপর নাযিল্কৃত কিতাব্ বলে চালিয়ে দেয় নি। তাছাড়া সারা দুনিয়ায় এ গ্রন্থের একটিই মাত্র সংস্করণ প্রচলিত আছে। কোথাও যদি কোনো মুদ্রণে কোনোরূপ সামান্যতম ছাপার ভুলও ঘটে, তো সাথে সাথে কেউ না কেউ সে ভুল নির্দেশ করেন এবং পূর্ব থেকে চলে আসা মুছ্বহাফ্ (কোরআন মজীদের কপি)-এর সাথে মিলিয়ে নিয়ে তা সংশোধন করে নেয়া হয়।

সর্বসম্মত মত অনুযায়ী, কোরআন মজীদ দীর্ঘ তেইশ বছরে অল্প অল্প করে নাযিল্ হয় এবং যখন যতোটুকু নাযিল্ হয় সাথে সাথেই তা লিপিবদ্ধ ও সমকালীন বহু মুসলমান কর্তৃক মুখস্ত করা হয়। কিন্তু যে ধারাক্রমে তা নাযিল্ হয় হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর নির্দেশক্রমে তা থেকে ভিন্ন এক বিন্যাসে গ্রন্থাবদ্ধ ও মুখস্ত করা হয়। যখনই কোনো সূরাহ্ বা আয়াত নাযিল্ হয় তখনই তিনি তাঁর ওয়াহী লেখকদেরকে ও অন্যান্য ছ্বাহাবীকে জানিয়ে দেন যে এ সূরাহ্ বা আয়াতের অবস্থান ইতিপূর্বে নাযিল্কৃত কোন্ সূরাহ্ বা কোন্ আয়াতের আগে বা পরে হবে।

কোরআন মজীদ এ বিন্যাসেই লেখা হয়, ছ্বাহাবীগণ মুখস্ত করেন এবং হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) ও তাঁর ছ্বাহাবীগণ তেলাওয়াত্ করেন। এভাবে দীর্ঘ তেইশ বছরে এ কাজ সমাপ্ত হয়। হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর ইন্তেকালের প্রায় তিন মাস আগে বিদায় হজ্বের সময় কোরআন মজীদের সর্বশেষ আয়াত নাযিল্ হয় এবং সাথে সাথেই পুরো

কোরআন মজীদ লিখিতভাবে ও শত শত হাফেয্ ছ্বাহাবীর স্মৃতিতে অভিন্ন বিন্যাসে গ্রন্থাকারে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়।

কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধকরণের কাজ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর নবুওয়াতী যিন্দেগীর শুরুতেই মক্কাহ্ নগরীতেই শুরু হয়। তখন ছ্বাহাবীদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানতেন তাঁরা যখনই কোরআন মজীদের কোনো সূরাহ্ বা আয়াত নাযিল্ হতো তখনই হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর নির্দেশিত অবস্থান অনুযায়ী লিখে রাখতেন। ফলে এর বিন্যাসে মুহূর্তের জন্যও কোনোরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নি, কেবল ধীরে ধীরে এর আয়তনই বৃদ্ধি পেয়েছে। হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) মক্কাহ্ নগরীতে থাকাকালেই যে ছ্বাহাবীগণ লিখিত কোরআন পাঠ করতেন এমন সুনির্দিষ্ট তথ্য ও দৃষ্টান্তও রয়েছে।

হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) মক্কাহ্ থেকে মদীনায় হিজরত করার পর স্বাভাবিকভাবেই কোরআন মজীদের আয়তন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর সেই সাথে সেখানে কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধকরণ ও মুখস্তকরণের কার্যক্রম ব্যাপকবিস্তৃত রূপ লাভ করে। বিশেষ করে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) তাঁর ছ্বাহাবীদেরকে লিখন-পঠন শিক্ষা দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; এমনকি ছ্বাহাবীদেরকে লিখন-পঠন শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে তিনি যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়ার কার্যক্রমও গ্রহণ করেন। আর এভাবে যে সব ছ্বাহাবী লেখাপড়া শিক্ষা করেন তাঁদের এ অক্ষরজ্ঞান কাজে লাগাবার প্রধান ক্ষেত্র, বরং বলা চলে যে, একমাত্র ক্ষেত্র ছিলো কোরআন মজীদ কপিকরণ ও তা থেকে দেখে দেখে পাঠকরণ। এই সাথে মুখস্তকরণের কার্যক্রম অধিকতর ব্যাপকভাবে চলতে থাকে।

রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর জীবদ্দশায় যারা কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধকরণের কাজ করতেন তাঁদেরকে "কাতেবে ওয়াহী" বলা হতো; বিভিন্ন সূত্রে এ ধরনের ৪৫ জন কাতেবে ওয়াহী ছ্বাহাবীর নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর

জীবদ্দশায়ই পুরো কোরআন মুখস্ত করেছিলেন এমন ২৩ জন ছ্বাহাবীর নাম উল্লেখ আছে।

ফলতঃ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর ইন্তেকালের পর কিছুদিনের মধ্যেই পুরো কোরআন মুখস্তকারী ছ্বাহাবীর সংখ্যা শত শত জনে দাঁড়ায়। অতঃপর পুরো কোরআন মুখস্তকারীদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে চলতে থাকে এবং তৃতীয় খলীফাহর যুগ পর্যন্ত পুরো কোরআন মুখস্তকারী (হাফেযে কোরআন)-এর সংখ্যা হাজার হাজারে উপনীত হয়।

এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) যে পুরো কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করিয়ে রেখে গিয়েছিলেন এ ব্যাপারে কোনোরূপ দ্বিমত বা বিতর্ক নেই। এমতাবস্থায় তাঁর রেখে যাওয়া মুছ্বহাফ্ (কোরআনের কপি), ছ্বাহাবীগণের অনেকের লিখিত ব্যক্তিগত মুছ্বহাফ্ এবং তাঁর জীবদ্দশায় পুরো কোরআন মুখস্তকারী হাফেযগণের হেফয মিলিয়ে পুরো কোরআন মজীদ তাঁর ইন্তেকালের পরে সাথে সাথে সর্বোচ্চ পর্যায়ের মুতাওয়াতির্ সূত্রে পরবর্তী লোকদের কাছে কাছে পৌঁছে যায় – যে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের বা দ্বিমতের অবকাশ নেই। শুধু তা-ই নয়, রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) ইন্তেকাল-পরবর্তী লোকদের কাছে তাঁর রেখে যাওয়া পুরো কোরআন নির্ভুলভাবে পৌঁছার ব্যাপারে ছ্বাহাবীদের মধ্যে যে মতৈক্য (ইজমা‘) ছিলো – এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ করার মতোও কোনো অকাট্য তথ্য পাওয়া যায় না। এ ইজমা‘র কারণেই, খুবই অল্প সময়ের মধ্যে পুরো কোরআন মুখস্তকারী হাজার হাজার হাফেযে কোরআন গড়ে ওঠেন, অথচ কোরআনের পাঠ (text) সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে সামান্যতমও মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় নি।

কোরআন মজীদের বিকৃতিহীনতা

কোরআন মজীদের মূল প্রামাণ্যতা অর্থাৎ এ কিতাব্ যে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) মানুষের সামনে পেশ করে গেছেন – এটা একটা

সর্বজনস্বীকৃত অকাট্য সত্য। কিন্তু এতে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অথবা তাঁর ইন্তেকালের পরে, কিছু সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে কিনা – এ মর্মে ইসলাম-বিরোধী প্রাচ্যবিদগণের অনেকের ও খৃস্টান মিশনারীদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের মনে সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ 'আক্বাএদের প্রাথমিক আলোচনায় যখন কোরআন মজীদ বাদে অন্য সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থের প্রামাণ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিচারবুদ্ধির রায়ে বাতিল হয়ে যায় তখন তাঁদের অনেকে স্বীকার করেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) আল্লাহর নবী এবং কোরআন মজীদ আল্লাহর কিতাব্। তবে সাথে সাথে তাঁরা কোরআন মজীদে অল্প হলেও কিছু বিকৃতি সাধিত হয়েছে বলে দাবী করেন। তাই এ বিষয়টির ওপর কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন।

এ ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর জীবদ্দশায় কোরআন মজীদে তাঁর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনোরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি বা বিকৃতি আদৌ সম্ভব ছিলো কিনা।

এ বিষয়ে সংক্ষেপে বলতে হয় যে, শুধু হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)ই নন, বরং সকল সবী-রাসূলই ('আঃ) ছিলেন সকল প্রকার পাপ ও অজ্ঞতাপ্রসূত কথনের অপরাধ থেকে মুক্ত। বিচারবৃদ্ধির দৃষ্টিতে কোনো নবীর পক্ষে গুনাহ্ করা ও ভুল কথা বলা অসম্ভব এবং তাঁদেরকে গুনাহ্ ও ভ্রান্ত কথন থেকে রক্ষা করা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যরূরী। কারণ, অন্যথায় মানুষের মন একজন নবীকে নবী বলে প্রত্যয়ের অধিকারী হতে পারতো না এবং সে ক্ষেত্রে নবীর ব্যাপারে তাদের জন্য আল্লাহর হুজ্জাত্ পূর্ণ হতো না। ফলে তারা নবীকে নবী হিসেবে মনে করতে না পারার কারণে প্রত্যাখ্যান করায় শাস্তিযোগ্য হতো না।

অবশ্য অনেকে মনে করেছেন যে, কোরআন মজীদের কতক আয়াত থেকে কয়েক জন নবী ('আঃ) গুনাহ্ করেছিলেন বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু আসলে তাঁরা ঐ সব আয়াতের সঠিক তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি।

[নবী-রাসূলগণের (‘আঃ) পাপমুক্ততা (‘ইছ্‌বমাতুল্ আম্বিয়া’) একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচ্য বিষয়। এ বিষয়ে আমার প্রণীত *জীবন জিজ্ঞাসা* গ্রন্থে বিচারবুদ্ধির আলোকে সংক্ষেপে ও *রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) আহলে বাইত্ ও বিবিগণ* গ্রন্থে অপেক্ষকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং বিচারবুদ্ধি ও কোরআনের আলোকে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার লক্ষ্যে *নবী-রাসূলগণের (‘আঃ) পাপমুক্ততা* শীর্ষক গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে হাত দেয়া হয়েছে; এ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি অনেক আগেই প্রস্তুত হয়েছে; আল্লাহ্ তা‘আলা তাওফীক্ব দিলে এটির পূর্ণতাবিধান করে পাঠক-পাঠিকাদের সামনে হাযির করা হবে।]

বিশেষভাবে রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) সম্বন্ধে কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى.

“আর তিনি প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না; তা (তিনি যা কিছু বলেন তা) তাঁর নিকট প্রত্যাদেশকৃত ওয়াহী ব্যতীত আর কিছুই নয়।” (সূরাহ্ আন্-নাজম : ৩-৪)

[এখানে ওয়াহী বলতে কোরআনের আয়াত হিসেবে পেশকৃত কথা এবং নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর শিক্ষা ও তথ্যমূলক যে কোনো কথাই শামিল রয়েছে। এর মধ্যে কোরআনের আয়াত হচ্ছে তেলাওয়াত্যোগ্য বা পঠনীয় ওয়াহী এবং অন্যান্য বক্তব্য হচ্ছে তেলাওয়াত বহির্ভূত ওয়াহী – যার মূল তাৎপর্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল্কৃত হলেও তার বাক্য ও শব্দচয়ন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর।]

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা‘আলা যাকে নবুওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে এটা একেবারেই অসম্ভব যে, তিনি স্বয়ং আল্লাহর কালামে পরিবর্তন সাধনের মতো ধৃষ্টতার পরিচয় দিতে সাহসী হবেন। আল্লাহ্ তা‘আলার শা’নে যারা ধৃষ্টতার পরিচয় দেয় এবং ধৃষ্টতাবশতঃ তাঁর নামে মিথ্যা বলে তাদের এ দুঃসাহসিক কাজের পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে আল্লাহ্ তা‘আলার পরিচয়ের সাথে সঠিকভাবে পরিচিত না থাকা এবং তাঁর অস্তিত্ব ও গুণাবলী সম্বন্ধে

অস্পষ্ট ধারণার অধিকারী হওয়া। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সরাসরি সম্পর্কের অধিকারী একজন নবীর পক্ষে এরূপ ধৃষ্টতার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোরআন মজীদে কোনোরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি বা বিকৃতি সাধনের কথা কল্পনাও করা যায় না।

এরপরও যদি আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নেই যে, যেহেতু নবীও ইচ্ছাশক্তি এবং স্বাধীনতা ও এখতিয়ারের অধিকারী একজন মানুষ সেহেতু তাঁর পক্ষে কোনো না কারণে আল্লাহর কালামে পরিবর্তন সাধনের চিন্তা করা অসম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা কি তাঁকে তা করার সুযোগ দেবেন?

বস্তুতঃ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং লোকেরা বিচারবুদ্ধির আলোকে তাঁর অতীত জীবনাচরণ পর্যালোচনা করে তাঁকে নবী হিসেবে মেনে নেয়ার এবং তাঁর পক্ষ থেকে কোরআন হিসেবে উপস্থাপিত বক্তব্যকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল্কৃত কিতাব্ হিসেবে গ্রহণ করে নেয়ার পরে তিনি যদি তাতে রদবদল করেন এবং এর ফলে লোকেরা হেদায়াত্ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে তাদেরকে সে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করার উপায় কী? এরূপ অবস্থায় তো লোকদেরকে পাকড়াও করা আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায়বিচারক বৈশিষ্ট্যের বরখেলাফ হবে। সুতরাং বিচারবুদ্ধির দাবী হচ্ছে এই যে, নবী যদি স্বেচ্ছায় তাতে কোনো পরিবর্তন সাধন করতে উদ্যোগী হন তাহলে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব হচ্ছে এতে হস্তক্ষেপ করা এবং কোরআনে বিকৃতিসাধন প্রতিহত করা। স্বয়ং কোরআন মজীদও এ কথাই বলছে, এরশাদ হয়েছে :

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ.

"আর তিনি যদি আমার নামে (নিজ থেকে) কতক কথা বলেন তাহলে অবশ্যই আমি তাঁর ডান হাত ধরে ফেলবো (তাঁকে পাকড়াও

করবো), এরপর অবশ্যই তাঁর গর্দান কেটে ফেলবো (ঘাড় মটকে দেবো/ অপমৃত্যু ঘটাবো)।” (সূরাহ্ আল্-হাকবক্বাহ্ : ৪৪-৪৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)কে ইচ্ছাকৃতভাবে কোরআনে বিকৃতিসাধনের কোনো সুযোগ দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, তাহলে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্যই ভণ্ডুল হয়ে যেতো।

হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর পক্ষ থেকে অনিচ্ছাক্রমে বা ভুলক্রমেও কোরআন মজীদে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিলো না। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে মানুষের কাছে স্বীয় বাণী পৌঁছানোর পিছনে যে উদ্দেশ্য নিহিত তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ ধরনের ভ্রান্তি থেকে নবীকে রক্ষা করা স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলারই দায়িত্ব এবং এ কাজ তাঁর জন্য খুবই সহজ।

কোরআন মজীদের যে কোনো সূরাহ্ বা আয়াত নাযিল্ হওয়ার সাথে সাথে তা নির্ভুলভাবে স্মরণে রাখার জন্য হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) খুবই যত্নবান ছিলেন এবং পাছে সামান্যও ভুল না হয় সে জন্য তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। এ কারণে তিনি তা মুখস্ত করার জন্য দ্রুত (এবং নিঃসন্দেহে বার বার) তা তেলাওয়াত্ করতেন। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা এ ব্যাপারে তাঁকে উদ্বিগ্ন হতে ও তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তিনি যাতে ভুলে না যান স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলাই তার নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এরশাদ হয়েছে :

لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

“(হে রাসূল!) আপনি এটা (কোরআন ও তার আয়াত/ সূরাহ্ মুখস্ত করা) দ্রুতায়নের জন্য আপনার জিহবাকে সঞ্চালিত করবেন না। নিঃসন্দেহে এর (কোরআনের) একত্রিতকরণ (সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণ) এবং এর পাঠ (সঠিকভাবে পাঠ করিয়ে দেয়া) আমারই দায়িত্ব। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করবো তখন আপনি তার সে

পাঠের অনুসরণ করুন। অতঃপর এর বিস্তারিত বর্ণনার দায়িত্বও আমার।” (সূরাহ্ আল্-ক্বিয়ামাহ্ : ১৬-১৯)

[নিঃসন্দেহে এখানে স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে পাঠ করার মানে হচ্ছে বাতাসে কোনো ধরনের শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি না করে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর অন্তঃকরণে বা তাঁর কানের মধ্যে কোরআন মজীদ বা তার সূরাহ্/আয়াতের উচ্চারণ সৃষ্টি করা - যা তাঁর সামনে বসে থাকা অন্য লোকদের পক্ষে শুনতে পাওয়া সম্ভব ছিলো না।]

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর পক্ষ থেকে অনিচ্ছাক্রমে বা ভুলক্রমেও কোরআন মজীদে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিলো না।

কিন্তু কোরআন মজীদের নির্ভুলতার সপক্ষে বিচারবুদ্ধির সর্বজনীন অকাট্য দলীল এবং স্বয়ং কোরআন মজীদের অকাট্য দলীলের সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর ওফাতের দুই শতাধিক বছর পরে সংকলিত কতক হাদীছগ্রন্থে উল্লেখকৃত কোনো না কোনো স্তরে কম সূত্রে বর্ণিত কতক (খবরে ওয়াহেদ) হাদীছের ভিত্তিতে অনেকে মনে করেন যে, কোরআন মজীদে নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে কিছু কিছু রদবদল হয়ে থাকতে পারে।

কতক পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ জেনেবুঝে সত্য গোপন করার লক্ষ্যে এবং কতক মুসলমান ‘ইলমী যোগ্যতায় ঘাটতি ও ত্রুটির কারণে এ ধরনের সন্দেহকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। পশ্চিমা প্রাচ্যবিদগণ ভালোভাবেই জানেন যে, কোরআন মজীদকে কেউ বিকৃত করতে পারে নি। কারণ, মানবজাতির ইতিহাসে সর্বোচ্চ মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত এ গ্রন্থের যেখানে সকল যুগে ও সকল দেশে একটিমাত্র সংস্করণ ছিলো এবং রয়েছে এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর ইন্তেকালের দুই শতাধিক বছরেরও পরে সংকলিত হাদীছ গ্রন্থ সমূহে কোনো কোনো স্তরে কম সূত্রে বর্ণিত (খবরে ওয়াহেদ্) হাদীছের ভিত্তিতে এ গ্রন্থের ওপরে বিকৃতির সন্দেহ মোটেই বিবেচনাযোগ্য নয়, বরং বিচারবুদ্ধির রায়ে ঐ সব হাদীছ জাল হিসেবে পরিগণিত।

যা-ই হোক, এতদসত্ত্বেও কোরআন মজীদে বিকৃতি ঘটেছে বলে ধারণা প্রদানকারী কতক কল্পকাহিনী সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করলে তা থেকেও এগুলোর মিথ্যা হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কোনো কোনো খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছের ভিত্তিতে দাবী করা হয় যে, একবার শয়তান কোরআন মজীদের আয়াতের মধ্যে মুশরিকদের কল্পিত দেব-দেবী লাত্, মানাত্ ও 'উযযা-র প্রশংসাসূচক দু'টি জাল আয়াত্ প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) বিষয়টি বুঝতে না পেরে তিনি তা তেলাওয়াত্ করেন, পরে প্রকৃত বিষয় জানতে পেরে তিনি তা কোরআন থেকে বাদ দেন।

এ ধরনের উদ্ভট কল্পকাহিনী কোরআন মজীদের পরিচয়ের সাথে পরিচিত সুস্থ বিচারবুদ্ধির অধিকারী কোনো মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। কারণ, আগেই যেমন উল্লেখ করেছি, কোরআন মজীদের মতো সর্বোচ্চ মুতাওয়াতির্ সূত্রে বর্ণিত গ্রন্থে খবরে ওয়াহেদ্ বর্ণনার ভিত্তিতে ত্রুটিনির্দেশ বা সংশয় পোষণ গ্রহণযোগ্য নয়; এ বিষয়ে এ ধরনের বর্ণনার কানাকড়ি মূল্য নেই, অন্যদিকে এটা কী করে সম্ভব হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে (ছ্বাঃ) বিভ্রান্ত করার জন্য এভাবে শয়তানকে সুযোগ দেবেন?

এতদসত্ত্বেও যদি কেবল তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে, এ ধরনের ঘটনা ঘটা সম্ভব, তাহলেও এ থেকে কোরআন মজীদের অবিকৃত থাকার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার উপায় নেই। কারণ, উক্ত বর্ণনা অনুযায়ীও শয়তানের সৃষ্ট বিভ্রান্তি পরে সংশোধন করা হয়। অনুরূপভাবে যদি ধরে নেয়া হয় যে, নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর দ্বারা অনিচ্ছাক্রমে এতে কিছু ভুলত্রুটি প্রবেশ করে থাকতে পারে (যদিও এরূপ ভুলত্রুটি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা বিচারবুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়) তাহলেও এটা নিঃসন্দেহ যে, এরূপ ভুলত্রুটি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সংশোধন করা হয়ে থাকবে।

তবে প্রকৃত ব্যাপার হলো নবী করীম (ছ্বাঃ) যখন কোরআন তেলাওয়াত্ করেছেন তখন স্মৃতি থেকে আমাদের তেলাওয়াতের মতো তাতে ভুল হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা ছিলো না। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁকে কোরআন পড়িয়ে দিতেন অর্থাৎ যখন কোরআন মজীদের কোনো অংশ নাযিল্ হতো এবং তিনি তা তেলাওয়াত করতে চাইতেন তখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর কণ্ঠে তা জারী করে দিতেন। আল্লাহ্ তা'আলা إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ – "নিঃসন্দেহে এর (কোরআনের) একত্রিতকরণ (সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণ) এবং এর পাঠ (সঠিকভাবে পাঠ করিয়ে দেয়া) আমারই দায়িত্ব।" বলতে এটাই বুঝিয়েছেন।

অন্যদিকে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর জীবদ্দশায় অন্য কোনো মানুষের পক্ষে কোরআন বিকৃত করার কোনো সুযোগই ছিলো না। বিশেষ করে এ ধরনের বিকৃতির কোনো দাবী বা এ মর্মে কোনো বর্ণনা নেই; এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে ইসলামের প্রথম যুগের ইসলাম-বিরোধীরা তা প্রচার করার সুযোগ হাতছাড়া করতো না। আসলে এ ধরনের অপচেষ্টার কথা ইসলামের কোনো দুশমনের মাথায় উদয় হলেও কার্যতঃ এরূপ অপচেষ্টা চালানো আদৌ সম্ভব ছিলো না। কারণ, কোথাও কোনো ব্যতিক্রমী আয়াত বা আয়াতাংশ বর্ণিত হলে, এমনকি একটি শব্দ এদিক-সেদিক করা হলেও তা যাচাই করার জন্য হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর কাছে পেশ করা হতো এবং তিনি তার মিথ্যা হওয়ার বিষয়টি ও কোরআন মজীদের সঠিক পাঠ সম্পর্কে জানিয়ে দিতেন। ফলে যে কেউই বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে যেতো। অন্যদিকে ঐ ব্যক্তি তার এ মিথ্যাচারের জন্য সমাজের কাছে চিহ্নিত ও ধিকৃত হতো।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, কোরআন মজীদের ভাষার প্রাঞ্জলতা, তাৎপর্যের সূক্ষ্মতা, বাচনভঙ্গি, সাহিত্যিক মান, জ্ঞানগর্ভতা ও বক্তব্যের পারম্পর্য এমন যে, তার মধ্য থেকে কোনো কিছু বাদ দেয়া বা তাতে কিছু

সংযোজন করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিলো না বা নয়; কেউ তা করলে কোরআন মজীদের ভাষার সাথে পরিচিত যে কারো কাছেই তা ধরা পড়ে যেতো। এটা কোরআন মজীদের মু'জিযাহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, একটি গ্রন্থ হিসেবে কোরআন মজীদ একটি পূর্ণাঙ্গ একক (unit) – যার বক্তব্যের রয়েছে একটি সামগ্রিক আবেদন এবং একটি বৃক্ষের ন্যায়। এ সামগ্রিক আবেদনের রয়েছে বৃক্ষের কাণ্ডের সাথে তুলনীয় একটি কেন্দ্রীয় বক্তব্য এবং রয়েছে শাখা-প্রশাখার সাথে তুলনীয় সূরাহ্ সমূহ। ফলতঃ প্রতিটি সূরাহর যেমন কোরআন মজীদের অংশ হিসেবে সামগ্রিক এককের মধ্যে একটি অবস্থান রয়েছে, তেমনি একেকটি একক হিসেবে রয়েছে নিজস্ব সামগ্রিকতা।

বস্তুতঃ একটি বৃক্ষের কোনো শাখা-প্রশাখা কেটে ফেললে বা এর কাণ্ডের গায়ে বাইরের কোনো বৃক্ষ থেকে কেটে নিয়ে আসা শাখা-প্রশাখা বসিয়ে দিলে তা যে কোনো মানুষের পক্ষে সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব। একইভাবে বৃক্ষটির কোনো শাখা থেকে কোনো প্রশাখা কেটে ফেললে বা বাইরে থেকে আনা কোনো প্রশাখা এর কোনো শাখার গায়ে বসিয়ে দিলে তা-ও সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব। কোরআন মজীদের অবস্থাও তা-ই।

মোট কথা, কোরআন মজীদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই এতে কোনোরূপ সংযোজন-বিয়োজন সম্ভব ছিলো না। এরপরও হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর জীবদ্দশায় কেউ সে চেষ্টা করলে বিন্দুমাত্র সফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো না। কারণ, কোরআন পাঠ বা উদ্ধৃতকরণের ক্ষেত্রে কারো কাছ থেকে কোনো ব্যতিক্রমী কিছু গোচরে এলে ছ্বাহাবীগণ অবশ্যই তা রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর গোচরে আনতেন এবং এর ফলে বিকৃতিকারী ইসলামের দুশমন হিসেবে চিহ্নিত ও মুসলিম সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হতো। [আর অমুসলিমদের পক্ষ থেকে

এ কাজ আদৌ সম্ভব ছিলো না। কারণ, কেউ কোরআন বা তার কোনো অংশই তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করতো না।]

বস্তুতঃ অবিকৃতভাবে কোরআন মজীদের সংকলন ও সংরক্ষণ ছিলো স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার অকাট্য ফয়সালাসমূহের অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ – "নিঃসন্দেহে এর (কোরআনের) একত্রিতকরণ (সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধকরণ) এবং এর পাঠ (সঠিকভাবে পাঠ করিয়ে দেয়া) আমারই দায়িত্ব।" – থেকেই এটা সুস্পষ্ট প্রমাণিত যে, কোরআন মজীদের নির্ভুলভাবে সংকলিত ও গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি মানবিক কার্যকারণ বিধির ওপর নির্ভরশীল ছিলো না। অর্থাৎ এটা সম্ভব ছিলো না যে, ওয়াহী লিপিবদ্ধকারীরা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে এর লিপির কাজ বন্ধ করে দেবেন, বা যারা হাফেযে কোরআন ছিলেন তাঁরা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে এটা অন্যদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছানো থেকে বিরত থাকবেন। অর্থাৎ এটা এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিপরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন ও চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত করার জন্য ঐ পরিকল্পনায়ই অনিবার্য করে রাখা হয়েছিলো।

ফলতঃ এ ছিলো এমন একটি বিষয় যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহর কাজে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতেন। অর্থাৎ কেউ কোরআনকে বিকৃত করতে তথা এতে কম-বেশী করতে বা এর বিন্যাসে পরিবর্তন করতে চাইলে কিছুতেই আল্লাহ্ তা'আলা তা করতে দিতেন না। এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর উদ্দেশে যা বলেছেন - যা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে - তা থেকেই প্রমাণিত হয়। কারণ, তিনি নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর উদ্দেশে এরশাদ করেন :

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ.

"আর তিনি যদি আমার নামে (নিজ থেকে) কতক কথা বলেন তাহলে অবশ্যই আমি তাঁর ডান হাত ধরে ফেলবো (তাঁকে পাকড়াও

করবো), এরপর অবশ্যই তাঁর গর্দান কেটে ফেলবো (ঘাড় মটকে দেবো/ অপমৃত্যু ঘটাবো)।” (সূরাহ্ আল্-হাকবক্বাহ্ : ৪৪-৪৬)

সুতরাং এটা সন্দেহাতীত যে, আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর জীবদ্দশায় বা তাঁর ইন্তেকালের পরে কোনো অবস্থায়ই কাউকে কোরআন মজীদে বিকৃতিসাধনের সুযোগ দিতেন না, বরং কেউ চেষ্টা করলে তাকে ধ্বংস করে দিতেন। অবশ্য কোনো অমুসলিমের পক্ষ থেকে এ ধরনের অপচেষ্টা চললে সে ক্ষেত্রে তাকে ঐশী হস্তক্ষেপের দ্বারা প্রতিহত করা অপরিহার্য ছিলো না। কারণ, কোনো অমুসলিম এ ধরনের বিকৃতিসাধন করে একটি বিকৃত কোরআন হাযির করলে তা মুসলমানদের কাছে তো নয়ই কোনো অমুসলিমের কাছেও গ্রহণযোগ্য হতো না। ফলে কোরআন মজীদ সম্পর্কে কারো মনেই সন্দেহ সৃষ্টি হতো না। কারণ, কোনো গ্রন্থে বিকৃতি কেবল তখনই প্রমাণিত হয় যখন অবিকৃত গ্রন্থটি আদৌ পাওয়া যাচ্ছে না বলে সর্বজনীন বিচারবুদ্ধি স্বীকার করে, অথবা যখন কোনো গ্রন্থের ধারক-বাহকদের পক্ষ থেকে সঠিক বলে একই গ্রন্থের দু’টি সংস্করণ হাযির করা হয় এবং উভয় গ্রন্থের সূত্রের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ণয় করা সম্ভব না হয়, অথচ দুই গ্রন্থের বক্তব্যে কিছু পার্থক্য থাকে। আর বলা বাহুল্য যে, সকল যুগে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কাছে কোরআন মজীদের অভিন্ন সংস্করণ ছিলো এবং রয়েছে।

তবে আমরা স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলার সিদ্ধান্ত ও হস্তক্ষেপের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে কেবল সর্বজনীন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও যদি বিচার করি – যা অমুসলিমদের কাছেও গ্রহণযোগ্য – তাহলে দেখতে পাই যে, কোরআন মজীদ স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধকরণ ও সুবিন্যস্তকরণের এবং মুখস্তকরণের মাধ্যমে এমনভাবে সংকলিত, সুবিন্যস্ত ও সংরক্ষিত হয় যে, এতে কোনোরূপ ত্রুটি প্রবেশ করানোর ক্ষমতা কারোই ছিলো না। তেমনি তাঁর ইন্তেকালের পরেও এর লিখিত কপিকরণের কাজ এমন ব্যাপকতা লাভ করে এবং এর মুখস্তকারীদের সংখ্যা অনবরত এমনভাবে বৃদ্ধি

পেতে থাকে যে, এতে হ্রাস-বৃদ্ধি বা এর বিন্যাসে পরিবর্তন সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা কোনো সুস্থ বিচারবুদ্ধির অধিকারী মানুষের মাথায়ই আসতে পারে না।

আল্লাহ্ তা‘আলা এ বিষয়টিও কোরআন মজীদে এভাবে ঘোষণা করেছেন :

إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

“আর নিঃসন্দেহে এ হচ্ছে সেই অকাট্য গ্রন্থ – যাতে না পূর্ব থেকে কোনো মিথ্যা প্রবেশ করেছে, না পরে (তাতে কোনো মিথ্যা প্রবেশ করা সম্ভব)। (কারণ,) এ হচ্ছে চিরপ্রশংসিত চিরপরমজ্ঞানী (আল্লাহ্ তা‘আলা) থেকে নাযিল্কৃত।” (সূরাহ্ হা-মীম্-আস্-সাজদাহ্/ ফুছ্ছিলাত্ : ৪১-৪২)

কোরআনের মুতাওয়াতির্ হওয়া প্রশ্নে সংশয় উপস্থাপন

কোরআন মজীদকে সংকলিত ও গ্রন্থাবদ্ধ করণ সংক্রান্ত হাদীছ সমূহকে বক্তব্যের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় এবং এ দুই ধরনের হাদীছের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা রয়েছে। এক ধরনের হাদীছের বক্তব্য হচ্ছে তা-ই যা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, কোরআন নাযিল্ হওয়ার সূচনাকাল থেকেই হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) কতক ছ্বাহাবীকে নাযিল্কৃত আয়াত ও সূরাহ্ সমূহ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন এবং নতুন নাযিল্কৃত সূরাহ্ ও আয়াতসমূহ পূর্বে নাযিল্কৃত সূরাহ্ ও আয়াতসমূহের মধ্যে কোথায় স্থান দেয়া হবে অর্থাৎ কোন্ সূরাহ্ বা আয়াতের আগে ও কোন্ সূরাহ্ বা আয়াতের পরে স্থান দিতে হবে তা তিনি নিজেই বলে দিতেন। ফলে এভাবেই কোরআন মজীদ বর্তমান বিন্যাসে লিপিবদ্ধ করা হয়। এভাবে নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর জন্য কোরআন মজীদের একটি কপি (মুছ্বহাফ্) প্রস্তুত করা হয় যেটিকে বর্তমানকালীন পরিভাষায় ‘সরকারী কপি’ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কোরআন মজীদ যে এভাবে সংকলিত ও

গ্রন্থাবদ্ধ হয় সে ব্যাপারে ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মতৈক্য ছিলো।

দ্বিতীয় ধরনের হাদীছগুলোর বক্তব্য এর সাথে সাংঘর্ষিক। কতক স্বল্পসংখ্যক সূত্রে বর্ণিত (খবরে ওয়াহেদ্) হাদীছ অনুযায়ী - যা রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর ওফাতের দুই শতাধিক বছর পরে সংকলিত হয় - হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ওফাতের কিছুদিন পরে প্রথম খলীফাহ্ হযরত আবূ বকরের নির্দেশে ছ্বাহাবী যায়দ বিন্ ছ্বাবেত্ কোরআন মজীদ সংকলন করেন। বলা হয় যে, ছ্বাহাবীদের যার কাছে যে সব লিখিত বা মুখস্তকৃত আয়াত ও সূরাহ্ ছিলো তা ঐ ছ্বাহাবীর কাছে নিয়ে আসতে বলা হয় এবং যে কারো আনীত সূরাহ্ বা আয়াতের গ্রহণযোগ্যতার জন্য কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী নিয়ে আসার শর্তারোপ করা হয়।

বলা হয় যে, এ শর্তারোপের ফলে কতক ছ্বাহাবী কর্তৃক কোরআন মজীদের আয়াত হিসেবে দাবী করে উপস্থাপিত কতক বক্তব্য নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ বিতর্কে শেষ পর্যন্ত, দু'জন সাক্ষী হাযির না করে আয়াত হিসেবে দাবী করে আনীত বক্তব্যসমূহ কোরআন মজীদের সংকলনে বাদ পড়ে যায়। এ থেকে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এর ফলে কতক প্রকৃত আয়াতও বাদ পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। তেমনি এ ধরনের রেওয়াইয়াত্-ও আছে যাতে বলা হয়েছে যে, কোরআন মজীদের শেষ দু'টি সূরাহ্ (সূরাহ্ আল্-ফালাক্ব ও সূরাহ্ আন্-নাস্) কোরআন মজীদের অংশ কিনা এ ব্যাপারে কোনো কোনো ছ্বাহাবীর সন্দেহ ছিলো। দাবী করা হয়েছে যে, একজন বিখ্যাত ছ্বাহাবী বলতেন যে, এ দু'টি সূরাহ্ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ওপর কোরআন মজীদের অংশ হিসেবে নয়, বরং ব্যক্তিগতভাবে পঠনীয় দো'আ হিসেবে নাযিল্ হয়েছিলো। এছাড়া কোনো কোনো ছ্বাহাবীর বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, অমুক সূরাহটি গ্রন্থাবদ্ধ কোরআনে যে আয়তনের রয়েছে রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) যুগে তার আয়তন এর চেয়ে অনেক বড় ছিলো।

এ সব হাদীছের ভিত্তিতে ইসলামের দুশমনরা, বিশেষ করে পশ্চিমা প্রাচ্যবিদগণের অনেকে কোরআন মজীদে বিকৃতি নেই জেনেও মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সংকলনকালে কোরআনে কম-বেশী হয়েছে বলে দাবী করে থাকেন।

এ সব হাদীছ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা সুস্থ বিচারবুদ্ধির অধিকারী যে কোনো লোকের কাছে সাদা দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। কারণ, একদিকে কোরআন মজীদ হচ্ছে মানবজাতির ইতিহাসে সর্বোচ্চ মুতাওয়াতির্ সূত্রে বর্ণিত গ্রন্থ - যা ইসলাম বিরোধী পণ্ডিতরা-ও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা কোরআন মজীদকে আল্লাহর কিতাব্ বলে স্বীকার করেন না, কিন্তু কতক ব্যতিক্রম বাদে তাঁদের সকলেই স্বীকার করেন যে, কোরআন মজীদ নবী করীম (ছ্বাঃ) যেভাবে রেখে গিয়েছেন ঠিক সেভাবেই আছে। ইসলামের পুরো ইতিহাসে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কাছে এ গ্রন্থের একটিমাত্র সংস্করণ থাকাও এরই প্রমাণ বহন করছে।

অন্যদিকে ইসলামী উম্মাহর মধ্যে প্রাথমিক যুগ থেকেই এ ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে যে, স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ) নিজ তত্ত্বাবধানে কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করার জন্য কতক ছ্বাহাবীকে কাতেবে ওয়াহী (ওয়াহী লিপিবদ্ধকারী) নিয়োজিত করেছিলেন এবং তাঁরা তাঁর উপস্থিতিতেই প্রতিটি সূরাহ্ ও আয়াত লিপিবদ্ধ করে তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী এ গ্রন্থের যথাস্থানে স্থান দিয়েছিলেন। এভাবে তাঁর জীবদ্দশায়ই কোরআন মজীদের একটি সরকারী কপি তৈরী হয়ে গিয়েছিলো। এছাড়াও অনেকে ব্যক্তিগতভাবে পুরো কোরআন লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং অনেকে মুখস্ত করেছিলেন।

এ ব্যাপারেও ইসলামী উম্মাহর মধ্যে ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই মতৈক্য রয়েছে যে, নবী করীম (ছ্বাঃ) নিয়মিতই সংশ্লিষ্ট সময় পর্যন্ত নাযিল্ হওয়া কোরআন মজীদ সংশ্লিষ্ট বিন্যাস অনুযায়ী তেলাওয়াত করতেন। ফলে তাঁর ইন্তেকালের পূর্বেই পুরো কোরআন মজীদের একটিমাত্র অভিন্ন পাঠ ও হুবহু অনুরূপ লিপিবদ্ধ বেশ

কিছুসংখ্যক কপি বিদ্যমান ছিলো – যার মধ্যে তাঁর নিজ তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধকৃত সরকারী কপি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু যে সব খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছে প্রথম খলীফাহর শাসনামলে কোরআন সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধ করা হয় বলে দাবী করা হয়েছে সে সব হাদীছে এর কোনো উল্লেখই নেই। কারণ, তা উল্লেখ করা হলে কথিত একজন ছ্বাহাবীর দ্বারা কোরআন সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধ করার যৌক্তিকতা ও উপযোগিতাই থাকে না। কারণ, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর রেখে যাওয়া কোরআন মজীদের সরকারী কপির এবং তাঁর জীবদ্দশায় কতক ছ্বাহাবীর লিখিত কপিসমূহ ও কতক ছ্বাহাবীর মুখস্তকৃত অভিন্ন কোরআন থাকা অবস্থায় প্রথম খলীফাহর পক্ষে নতুন করে কোরআন সংকলনের উদ্যোগ নেয়ার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন আদৌ সম্ভব ছিলো না। নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর রেখে যাওয়া কপিকে উপেক্ষা করে এভাবে নতুন করে কোরআন সংকলনের উদ্যোগ নিলে, বিশেষ করে মাত্র দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোরআনের আয়াত প্রমাণের শর্ত রাখা হলে তাঁর বিরুদ্ধে দস্তুরমতো কোরআন ও রাসূলের ('আঃ) প্রতি অবমাননার অভিযোগ উঠতো এবং তাঁকে উৎখাত ও হত্যার জন্য একটি মোক্ষম কারণ তৈরী হয়ে যেতো। কিন্তু কোনো সূত্রেই প্রথম খলীফাহর বিরুদ্ধে এ ধরনের কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার কথা পাওয়া যায় না।

সূতরাং এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই যে, প্রথম খলীফাহর শাসনামলে কোরআন মজীদ নতুন করে সংকলনের কোনো ঘটনাই সংঘটিত হয় নি। বরং এতদসংক্রান্ত যতো হাদীছ আছে তার সবগুলোই মিথ্যা। মূলতঃ ছ্বাহাবীদের নামে বর্ণিত এ সব খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ হাদীছ-সংকলকগণ কর্তৃক সংকলিত করার সময় পর্যন্ত দুই শতাধিক বছরকালের মধ্যে অনেকগুলো স্তর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এ সব স্তরের মধ্যে যে কোনো স্তরে এ সব হাদীছ মিথ্যা রচনা করে রচনাকারীরা তাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে এগুলো শুনেছে বলে মিথ্যা দাবী করে বর্ণনার ধারাক্রম ছ্বাহাবীদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছিলো।

অন্যদিকে কতক বর্ণনা রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) যুগের কতক মুনাফিক্ব কর্তৃকও দেয়া হয়ে থাকতে পারে – যারা বাহ্যতঃ ঈমানের ঘোষণা দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে শামিল হয়ে গিয়েছিলো এবং নিজেদেরকে ছ্বাহাবী হিসেবে পরিচয় দিয়ে মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানে বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) কাছ থেকে আরো কিছু আয়াত শুনেছিলো বলে দাবী করেছিলো।

হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) কর্তৃক নিজ তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধকৃত কোরআন মজীদের কপি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও প্রথম খলীফাহ্ কর্তৃক কোরআন সংকলন ও লিপিবদ্ধ করানোর যৌক্তিকতা কী? এ প্রশ্নের জবাবে অনেকে বলেন যে, যেহেতু নবী করীম (ছ্বাঃ) কোরআন মজীদের যে কপি লিখিয়ে রেখে যান তা তৎকালে কাগয দুর্লভ ছিলো বিধায় কাগযের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার্য বিভিন্ন আকার ও উপাদানের বস্তুতে লেখা হয়েছিলো। এগুলো ইট, পাথর, চামড়া, হাড্ডি ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুর ওপর লেখা ছিলো। এ কারণে, ব্যবহারের সুবিধার কথা চিন্তা করে কোরআন মজীদ অভিন্ন উপাদান ও আকারের উন্নততর বস্তুর ওপরে লেখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বস্তুতঃ এ ধরনের ব্যাখ্যা হচ্ছে এক ধরনের খোঁড়া যুক্তি। কারণ, ব্যবহারের সুবিধার কথা চিন্তা করে কোরআন মজীদ অভিন্ন উপাদান ও আকারের উন্নততর বস্তুর ওপরে লেখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে থাকলে সে জন্য নতুন করে লোকদের কাছ থেকে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য সহ আয়াত আহবানের কোনো প্রয়োজন ছিলো না। সে ক্ষেত্রে নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর রেখে যাওয়া কপি থেকে এক বা একাধিক লিপিকারের দ্বারা অভিন্ন উপাদান ও আকারের উন্নততর বস্তুর ওপরে এক বা একাধিক কপি লেখানোই যথেষ্ট ছিলো।

মোট কথা, প্রথম খলীফাহর শাসনামলে কোরআন মজীদ নতুন করে সংকলন ও লিপিবদ্ধকরণের দাবী মিথ্যা কল্পকাহিনী বৈ নয়।

প্রথম খলীফাহর শাসনামলে কোরআন মজীদ সংকলনের ধারণাটি একটি বহুলপ্রচারিত বিষয় এবং এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা

সুদীর্ঘলালিত বিশ্বাস পরিত্যাগ করা অনেকের পক্ষেই কঠিন অনুভূত হতে পারে। এ ধারণার সপক্ষে বহু হাদীছ রয়েছে। কিন্তু এ হাদীছগুলোর সবই খবরে ওয়াহেদ্ পর্যায়ের। আর খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ্ ছ্বহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে 'আকল্ল, কোরআন মজীদ, মুতাওয়াতির্ হাদীছ ও ইসলামের প্রথম যুগ থেকে চলে আসা উম্মাহর মতৈক্যের বিষয়গুলোর কোনোটিরই বরখেলাফ না হওয়ার শর্তে কেবল গৌণ (মুস্তাহাব্ ও মাকরূহ্) ব্যাপারে ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য এবং ফরয নয় এমন 'ইলমী ক্ষেত্রে ইয়াক্বীন্ সৃষ্টিকারী হতে পারে।

সুতরাং উপরোক্ত শর্তে কোরআন মজীদের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ সহায়ক হতে পারে, কিন্তু কোরআন প্রমাণের ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছের আশ্রয় নেয়া যেতে পারে না। কারণ, তা কোরআন মজীদের ভিত্তির ওপর দুর্বলতা আরোপ করে তথা তা কোরআন মজীদের ওপর সংশয় আরোপের সমার্থক। আর কোরআন মজীদ যেহেতু সর্বোচ্চ মুতাওয়াতির্ বর্ণনা সেহেতু কোরআন মজীদের অকাট্যতা ও নির্ভুলতা এবং সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারে সংশয় বা দুর্বলতা আরোপ হতে পারে এমন বক্তব্য সম্বলিত কোনো বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং এ ধরনের বক্তব্য যদি ছ্বাহাবীদের নামে, এমনকি হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর নামেও বর্ণিত হয় তো নিঃসন্দেহে তা পরবর্তীকালে মিথ্যা রচনা করে তাঁর বা তাঁদের নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে।

যারা এ সব হাদীছকে প্রত্যাখ্যানে দ্বিধান্বিত তাঁদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের পিছনে দু'টি কারণ নিহিত বলে মনে হয়। তা হচ্ছে, প্রথমতঃ বর্ণিত ঘটনাটি প্রথম খলীফাহর শাসনামলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর অন্যতম বলে বিবেচিত হয়। তেমনি এ কাজকে প্রথম খলীফাহর ও যে ছ্বাহাবীর নাম কোরআন মজীদের সংকলক হিসেবে উল্লেখ করা হয় হয় (যায়েদ্ বিন্ ছাবেত্) তাঁর মর্যাদার প্রতীক হিসেবে পরিগণিত। দ্বিতীয়তঃ বহু বিখ্যাত হাদীছ সংকলন ও তাফসীর গ্রন্থে এ সব হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে।

এ সব হাদীছকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করলে তা তাঁদের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতার হানি ঘটাতে পারে বলে আশঙ্কা জাগতে পারে।

কিন্তু এ ধরনের আশঙ্কা পুরোপুরি অমূলক। কারণ, কোরআন মজীদকে সংকলিত ও গ্রন্থাবদ্ধকরণের কথিত ঘটনা বাদ দিলেও সংশ্লিষ্ট ছ্বাহাবীদের গুরুত্ব ও গুরত্বপূর্ণ অবস্থানের তেমন একটা হেরফের হবে না। অন্যদিকে যে সব মুফাসসির ও হাদীছ-সংকলক সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও এতদসংশ্লিষ্ট হাদীছ সমূহ বর্ণনা করেছেন তাঁদের প্রত্যেকে আরো শত শত ঘটনা ও হাজার হাজার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ থেকে দু'একটি ঘটনা ও এতদসংশ্লিষ্ট হাদীছ সমূহ প্রত্যাখ্যাত হলে তাতে তাঁদের মর্যাদা খুব একটা হ্রাস পাবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া তাঁদের কেউই ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতার উর্ধে ছিলেন না এবং তাঁরা নিজেরাও নিজেদেরকে ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতার উর্ধে বলে দাবী করেন নি। তাই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করা সত্ত্বেও তাঁদের সংকলিত হাদীছগ্রন্থ সমূহে ও তাঁদের লিখিত তাফসীরগ্রন্থ সমূহে কিছু অসত্য ঘটনা এবং জাল, বিকৃত ও দুর্বল হাদীছ স্থানলাভ করা অসম্ভব নয়। এ কারণে তাঁদের মেধাপ্রতিভা, নিষ্ঠা ও ইখলাছ্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হবার কোনো কারণ নেই। বিশেষ করে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ওফাত ও সংশ্লিষ্ট হাদীছ-সংকলন সমূহের সংকলনকালের মধ্যে কালগত ব্যবধানের (কমপক্ষে দু'শ' বছরের) কারণে এ ধরনের ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

তবে এ প্রসঙ্গে অনেকের কাছে অবাঞ্ছিত মনে হলেও 'ইলমী দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ না করলে নয়। তা হচ্ছে : হাদীছ সংকলকগণও এ সত্যটি স্বীকার করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর ওফাত ও হাদীছ সংকলনের মধ্যবর্তী সুদীর্ঘকালীন ব্যবধানে অসংখ্য মিথ্যা হাদীছ তৈরী হয়। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব মানদণ্ডে বিচার করে অনেক হাদীছকে জাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং যেগুলোকে গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন সেগুলোকে নিজ নিজ সংকলনে স্থান দিয়েছেন।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, তাঁরা নিজেরা ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতার উর্ধে ছিলেন না। ফলে তাঁদের হাদীছ পরীক্ষার মানদণ্ড পুরোপুরি নিখুঁত ও নির্ভুল ছিলো না। বিশেষ করে তাঁরা বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতার ওপরে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু দীর্ঘ দুই শতাধিক বছরের সবগুলো স্তরের সকল বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে অকাট্য জ্ঞানে উপনীত হওয়া সম্ভব ছিলো না।

অন্যদিকে প্রচলিত সংজ্ঞায় ছ্বাহাবীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর সময়কার মুনাফিক্বদেরকেও শামিল করা হয় (কোরআন মজীদের উক্তি অনুযায়ী যাদের সংখ্যা ছিলো অনেক এবং তিনি নিজেও যাদের অনেকের নেফাক্বের কথা জানতেন না), আর অন্ধ ভক্তিবশতঃ ছ্বাহাবীদের আমলের প্রতি দৃষ্টি না দেয়ার ফলে মুনাফিক্বদেরকে প্রকৃত ছ্বাহাবী থেকে পৃথক করা হয় নি। ফলে বর্ণনাকারীদের যে কোনো স্তরে মিথ্যা হাদীছ রচনা অসম্ভব ছিলো না।

এছাড়া হাদীছ সংকলকগণ মূলতঃ সংগ্রাহক ছিলেন, জ্ঞানগবেষক ছিলেন না। এ কারণেই তাঁরা ছ্বাহাবী স্তরে কম সূত্রে বর্ণিত (খবরে ওয়াহেদ) হাদীছ পরীক্ষার ক্ষেত্রে অকাট্য চার দলীল অর্থাৎ 'আক্বল্, কোরআন, মুতাওয়াতির্ হাদীছ এবং উম্মাহর অভিন্ন আচরণ ও মতের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ার শর্তের প্রতি দৃষ্টি দিতে ব্যর্থ হন। তাই সংকলকদের দ্বারা ছ্বহীহ্ হিসেবে চিহ্নিত হাদীছ সমূহের মধ্যে অনেক জাল হাদীছ থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিলো।

বস্তুতঃ বিচারবুদ্ধির রায় এবং কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে নীতিগতভাবেই উপরোক্ত চার দলীলের যে কোনোটির সাথে সাংঘর্ষিক বা কোরআন মজীদের নির্ভুলতায় সংশয় আরোপকারী যে কোনো বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত। কারণ, অকাট্য দলীলের মোকাবিলায় এ ধরনের দুর্বলতাযুক্ত দলীল সর্বজনীন বিচারবুদ্ধি কখনোই গ্রহণ করে না। তাছাড়া এ সব হাদীছ কেবল ইসলামের দুশমনদের দ্বারা কোরআন মজীদ সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে না, বরং

এ সব হাদীছের মধ্যে বহু স্ববিরোধিতা রয়েছে এবং এগুলোর মোকাবিলায় এমন কিছু প্রশ্নের উদ্রেক হয় যার জবাব এ সব হাদীছ থেকে পাওয়া যায় না।

মোদ্দা কথা, সর্বজনস্বীকৃত মতের দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) কোরআন মজীদকে বর্তমান বিন্যাসে লিখিয়েছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন এবং জীবনের শেষ দিকে ছ্বাহাবীদের সামনে পুরো কোরআন মজীদ উক্ত বিন্যাস অনুযায়ী তেলাওয়াত করেছেন। সুতরাং অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, কোরআন মজীদ তাঁর ইন্তেকালের পূর্বেই পুরোপুরি ও সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত হয়েছিলো, ছড়ানো-ছিটানো বা অবিন্যস্ত ছিলা না। আর গ্রন্থাবদ্ধকরণ বলতে পুরোটা সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধকরণকেই বুঝায়। সুতরাং প্রথম খলীফাহ্র নির্দেশে কোরআন মজীদ নতুন করে গ্রন্থাবদ্ধকরণের প্রশ্নই ওঠে না।

আসলেই, এটা কী করে সম্ভব যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) কর্তৃক কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করানো সম্বন্ধে প্রথম খলীফাহ্ সহ শীর্ষস্থানীয় ছ্বাহাবীদের জানা থাকবে না এবং নতুন করে কোরআন সংকলনের উদ্যোগ নেয়ার পর তা বিরোধিতার সম্মুখীন হবে না?

অবশ্য একটি সম্ভাবনা যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারতো, তা হচ্ছে, প্রথম খলীফাহ্ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর রেখে যাওয়া কোরআন মজীদের কপি থেকে নিজের জন্য একটি সহজব্যবহার্য কপি করাতে পারতেন এবং এ কাজে ছ্বাহাবী যায়দ বিন্ ছাবেত্ অথবা অন্য এক বা একাধিক ছ্বাহাবীকে লিপিকার নিয়োজিত করতে পারতেন। কিন্তু বর্ণিত হাদীছসমূহে এমন কোনো কথা বলা হয় নি, বরং নবী করীম (ছ্বাঃ) কর্তৃক কোরআন বিন্যস্ত ও লিপিবদ্ধকরণ তথা গ্রন্থাবদ্ধ করানোর কথা বেমালূম্ ভুলে গিয়ে কোরআন মজীদকে প্রথম বারের মতো সংগ্রহ ও গ্রন্থাবদ্ধকরণের দাবী করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে মানবিক বিচারবুদ্ধি সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে যে অকাট্য উপসংহারে উপনীত হয় তা হচ্ছে, প্রথম দুই খলীফাহর আমলে কোরআন মজীদের যে সব কপি তৈরী হয়েছিলো তার মধ্য থেকে কতক কপি হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর রেখে যাওয়া কপি থেকে এবং কতক কপি যে সব ছ্বাহাবীর কাছে পুরো কোরআনের কপি ছিলো তাঁদের কপি থেকে অনুলিখন করা হয়েছিলো। এছাড়াও অনেকে পুরো কোরআনের হাফেযগণের কাছ থেকে শুনে কপি করে থাকবেন। অবশেষে তৃতীয় খলীফাহ্ হযরত 'উছমানের নির্দেশে সরকারীভাবে কোরআন মজীদের বেশ কিছু সংখ্যক কপি করা হয় – যার অনুলিপি বর্তমানে আমাদের হাতে রয়েছে; এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এ সব কপি হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর রেখে যাওয়া কপি থেকেই অনুলিপি করা হয়ে থাকবে।

যে সব হাদীছকে হাতিয়ার বানিয়ে ইসলামের দুশমনরা কোরআন মজীদের অবিকৃত থাকার ব্যাপারে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে সেগুলোকে ছ্বহীহ্ গণ্য করা এবং গোঁজামিলের আশ্রয় নিয়ে সেগুলোর ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা এক আত্মঘাতী কর্মনীতি বৈ নয়। বিশেষ করে এ ধরনের গোঁজামিলের ব্যাখ্যা কোনো সুস্থ বিচারবুদ্ধি ও মুক্ত বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তাছাড়া এ সংক্রান্ত হাদীছের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে মুসলিম মনীষীদের মধ্যে বিতর্ক ছিলো এবং রয়েছে। এগুলোর যথার্থতা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে মুফাসসিরীন, মুজতাহিদীন ও ওলামায়ে মুতাক্বাদ্দিমীনের মধ্যে মতপার্থক্য ছিলো। এমতাবস্থায় এগুলোকে ছ্বহীহ্ বলে দাবী করে গোঁজামিলের আশ্রয় নিয়ে ব্যাখ্যা করলে কোরআন-বিরোধীরা তথা ইসলামের দুশমনরা এ সব হাদীছের "ছ্বহীহ্" সার্টিফিকেটকে গ্রহণ করে কোরআনের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবে, কিন্তু এগুলোর গোঁজামিলের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করবে না। এভাবে তারা কোরআন মজীদের অকাট্যতা ও নির্ভুলতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে কোরআন মজীদের ওপর মুসলমানদের ঈমানকে বিনষ্ট করে দেবে। সুতরাং এ

ধরনের হাদীছের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টা করা কোরআন মজীদের ভিত্তিকে ধ্বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করার নামান্তর।

সুতরাং, বিচারবুদ্ধির রায় অনুযায়ী, মানব জাতির ইতিহাসে সর্বোচ্চ মুতাওয়াতির্ সূত্রে বর্ণিত মহাগ্রন্থ কোরআন মজীদের অবিকৃত ও সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশংয় সৃষ্টি করে এমন যে কোনো হাদীছকে মিথ্যা গণ্য করে নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এ প্রত্যাখ্যানের জন্য এগুলোর কোরআন-বিরাধী হওয়াই যথেষ্ট; এ সব হাদীছকে অন্য কোনো মানদণ্ডে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার আদৌ প্রয়োজন নেই; এ ধরনের পরীক্ষার প্রয়োজন আছে বলে মনে করাও কোরআন মজীদের ওপরে ঈমানে দুর্বলতার পরিচায়ক।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে, কোরআন মজীদের ঐশিতা এবং এর অকাট্যতা হচ্ছে ইসলামের উছূলে 'আক্বাএদের তিনটি বিষয়ের অন্যতম। কারণ, অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাও'আত্ দিতে হলে কেবল সমগ্র মানবপ্রজাতির কাছে সমভাবে গ্রহণযোগ্য সর্বজনীন মানদণ্ড বিচারবুদ্ধি ('আক্বল্)-এর মানদণ্ডেই দিতে হবে। আর তাওহীদ ও আখেরাত হচ্ছে এমন বিষয় যা যে কারো কাছে প্রমাণের জন্য কেবল 'আক্বলী দলীলই যথেষ্ট। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে কোনো নবীকে নবী হিসেবে চিনতে পারার জন্য সকলের কাছে 'আক্বলী দলীল যথেষ্ট নয়। কারণ, কোনো ব্যক্তি যে সব তথ্য পর্যালোচনা করে একজন নবীকে নবী হিসেবে গ্রহণ করবে সে সব তথ্য তার কাছে নির্ভুলভাবে ও গ্রহণযোগ্য মাধ্যমে পৌঁছার ব্যাপারটি স্থানগত, কালগত ও অন্যান্য কারণে সব সময় প্রত্যয় (ইয়াক্বীন্) সৃষ্টিকারী পর্যায়ের না-ও হতে পারে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল (ছ্বাঃ)কে এমন একটি মু'জিযাহ্ দিয়ে প্রেরণ করেন যার ই'জায্ (মু'জিযাহর গুণ) ক্বিয়ামত পর্যন্ত অটুট থাকবে। এ মু'জিযাহ্ হচ্ছে এর যে কোনো সূরাহর সাথে তুলনীয় একটি সূরাহ্ রচনা করে আনা। সুতরাং কেউ যদি রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর জীবনচরিতের ব্যাপারে মিথ্যাবাদীদের মিথ্যা

প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ও তথাপি কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জ তাকে কোরআনকে ঐশী গ্রন্থ বলে মানতে বাধ্য করতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে কোরআনের প্রতি ঈমানের কারণেই সে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর নবুওয়াতে ঈমান পোষণ করতে বাধ্য হবে। সুতরাং প্রকারান্তরে ইসলামের উছূলে 'আক্বাএদের তিনটি বিষয় হচ্ছে তাওহীদ, আখেরাত্ ও কোরআন মজীদ। তাই কোরআনের পরিচয়ের জন্য কেবল 'আক্বলী দলীলই যথেষ্ট; এ জন্য খবরে ওয়াহেদ্ বর্ণনাকে আদৌ আলোচনায় স্থান দেয়া যাবে না।

মুছ্বহাফে 'উছমান্ চাপিয়ে দেয়ায় বিকৃতির সন্দেহ

কোরআন-বিরোধীরা তৃতীয় খলীফাহ্ হযরত'উছমান্ কর্তৃক কোরআন মজীদের অভিন্ন কপি – যা "মুছ্বহাফে 'ঊছমান্" নামে পরিচিত – প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণকে বাহানা করে কোরআন মজীদে বিকৃতি ঘটে থাকতে পারে বলে সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

সর্বজনগ্রহণযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী মুছ্বহাফে 'উছমান্ প্রচারের ঘটনাটি ছিলো নিম্নরূপ :

হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর রেখে যাওয়া কোরআন মজীদের সরকারী কপি [ভিত্তিহীন তথ্য অনুযায়ী ছ্বাহাবী যায়েদ্ বিন্ ছাবেত্ কর্তৃক সংকলিত ও লিপিবদ্ধকৃত সরকারী কপি] থেকে এবং বিভিন্ন ছ্বাহাবী কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত ব্যক্তিগত কপি থেকে, সেই সাথে কোরআনের হাফেযগণের কাছ থেকে শুনে ব্যাপকভাবে কপি করা হয়। এভাবে কোরআন মজীদের বিপুল সংখ্যক কপি আরব উপদ্বীপের প্রত্যন্ত এলাকায় ও এর বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের হাতে থাকা কতক কপিতে কিছু ছোটখাট ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর যুগে তাঁর পক্ষ থেকে আরব গোত্রসমূহকে স্থানীয় উচ্চারণে কোরআন পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। পরে অনেকে শ্রুতি থেকে স্থানীয় উচ্চারণেই কোরআন লিপিবদ্ধ করেন।

এর ফলে অর্থের ক্ষেত্রে কোনোরূপ পরিবর্তন না ঘটলেও কিছু কিছু শব্দের বানানে পার্থক্য ঘটে এবং বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত উচ্চারণেও পার্থক্য দেখা যায়। এ সব উচ্চারণপার্থক্যকে কেন্দ্র করে অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া-বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় এ ধরনের উচ্চারণপার্থক্য দূর করে কোরআন মজীদের অভিন্ন উচ্চারণ নিশ্চিতকরণ ও আঞ্চলিক উচ্চারণ বর্জিত করার লক্ষ্যে তৃতীয় খলীফাহ্ হযরত'উছমান্ শীর্ষস্থানীয় ছ্বাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে তাঁদের সহায়তায় কোরআন মজীদের মূল সরকারী কপি থেকে কয়েকটি অনুলিপি তৈরী করিয়ে ইসলামী জাহানের সকল প্রশাসনিক কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন এবং সকলকে তাঁদের কাছে রক্ষিত কোরআন মজীদের নিজ নিজ কপির লিপি সরকারী কপির সাথে মিলিয়ে নিয়ে সংশোধন করার নির্দেশ দেন এবং সংশোধনযোগ্য নয় এমন বেশী বা বড় ধরনের ত্রুটিপূর্ণ কপিগুলো সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলা হয়।

এভাবে কোরআন মজীদের ত্রুটিপূর্ণ কপিসমূহের ধ্বংসসাধন এবং সকলকে নিজ নিজ কপিকে সরকারী কপির অনুরূপ করে সংশোধন করতে বাধ্য করার বিষয়টিকে বাহানা করে অনেক পরবর্তীকালে ইসলামের দুশমনরা বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। তারা বুঝাতে চায় যে, খলীফাহ্ 'উছমানের এ পদক্ষেপের পূর্বে কোরআন মজীদের অভিন্ন পাঠ (text) ছিলো না, সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) কোরআন মজীদের কোনো অভিন্ন লিখিত কপি রেখে যান নি। দ্বিতীয় যে কথাটি তারা বুঝাতে চায় তা হচ্ছে, খলীফাহ্ 'উছমান্ কর্তৃক প্রচারিত কপি কোরআনের তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন পাঠ সম্বলিত কপিসমূহের মধ্যকার একটি কপি মাত্র এবং সেটি যে, কোরআনের নির্ভুলতম কপি ছিলো তার কোনো প্রমাণ নেই, সুতরাং কোরআনে বিকৃতির শক্তিশালী সম্ভাবনা রয়েছে। তারা তৃতীয় যে ধারণাটি তৈরী করতে চায় তা হচ্ছে, খলীফাহ্ 'উছমান্ কোরআন মজীদের অভিন্ন কপি চাপিয়ে দেয়ার আগে তাতে রদবদল

করিয়ে থাকতে পারেন এবং এ কারণেই অর্থাৎ এ রদবদলকে চিরতরে চাপা দেয়ার লক্ষ্যে এর সাথে মিলবিহীন কপিগুলোকে ধ্বংস করে ফেলেন।

বলা বাহুল্য যে, ইসলামের দুশমনদের, বিশেষ করে পশ্চিমা প্রাচ্যবিদদের পক্ষ থেকে এ বিষয়টিকে বড় করে তুলে ধরার পিছনে অজ্ঞতা নয়, বরং অসদুদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল। কারণ, তাদের ভালোই জানা ছিলো এবং আছে যে, খলীফাহ্ 'উছমান্ কর্তৃক কোরআন মজীদে কোনো পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন ছিলো না এবং তা সম্ভবও ছিলো না। কারণ, এতে কোনোরূপ পরিবর্তনের অপচেষ্টা চালালে তা তাঁর জন্য গুরুতর রকমের বিপজ্জনক ব্যাপার হতো। কারণ, এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, ছ্বাহাবীগণ কোরআন মজীদকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসতেন। সেহেতু কোরআন মজীদের সরকারী কপি করার সময় কপিকারকগণ এতে মূল কপি থেকে পরিবর্তন সাধনে কিছুতেই সম্মত হতেন না, বরং তাঁরা খলীফাহর আদেশ অমান্য করতেন।

দ্বিতীয়তঃ এর পরও তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয় যে, কোনো না কোনো কারণে কতক কপিকারক এ কাজে (কোরআনে রদবদল সাধনে) সহযোগিতা করেছিলেন তো সে ক্ষেত্রে যে সব ছ্বাহাবী স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) যুগে কোরআন মজীদের কপি করেছিলেন এবং তাঁদের কপি থেকে যারা কপি করেছিলেন তাঁরা কিছুতেই খলীফাহর এ ধরনের কোনো উদ্যোগকে নীরবে হযম করতেন না; অবশ্যই তাঁরা কোরআনের খাতিরে কথিত এ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেন এবং খলীফাহ্ তা না মানলে তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন, এমনকি তাঁকে ও তাঁর লিপিকারদেরকে হত্যা করতেও দ্বিধা করতেন না। কিন্তু এ ব্যাপারে বিদ্রোহ তো দূরের কথা, প্রতিবাদের কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো বলেও জানা যায় না।

তৃতীয়তঃ যে সব শীর্ষস্থানীয় ছ্বাহাবী রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) জীবদ্দশায় পুরো কোরআন লিপিবদ্ধ করেছিলেন [যেমন : হযরত 'আলী ('আঃ)] তাঁদের কারো ব্যক্তিগত কপি খলীফাহ্ 'উছমানের সরকারী

কপির সাথে মিলিয়ে সংশোধনের কোনো ঘটনা জানা যায় না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ সব কপি ও খলীফাহ্র সরকারী কপার মধ্যে কোনোই পার্থক্য ছিলো না। সুতরাং খলীফাহ্র সরকারী কপিগুলো ছিলো হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর নির্দেশে লিপিবদ্ধকৃত কপির হুবহু অনুলিপি।

চতুর্থতঃ খলীফাহ্ 'উছমানের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে তাঁর সাথে অনেক শীর্ষস্থানীয় ছ্বাহাবীর বিরোধ তৈরী হয়। সুতরাং খলীফাহ্র নির্দেশে কোরআন মজীদে পরিবর্তন সাধন করা হলে নিঃসন্দেহে তাঁরা এ কারণে খলীফাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন। বিশেষ করে বীরত্ব, সাহসিকতা ও আপোসহীনতার জন্য সর্বজনখ্যাত হযরত 'আলী ('আঃ) - কৌশলে যাকে তৃতীয় খলীফাহ্র পদ থেকে বঞ্চিত করে হযরত 'উছমানকে খলীফাহ্ করা হয়েছিলো - কিছুতেই এ কাজ নীরবে হযম করতেন না।

কিন্তু কোরআন বিকৃত করার অভিযোগে খলীফাহ্র বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন বলে কোনো সূত্রেই উল্লেখ করা হয় নি। এমনকি পরবর্তীকালে যারা তৃতীয় খলীফাহ্র বিরুদ্ধ প্রশাসনিক অযোগ্যতা ও স্বজনপ্রীতির কারণে অনেক শীর্ষস্থানীয় ছ্বাহাবীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করেন তাঁরাও তাঁর বিরুদ্ধে কোরআন মজীদে রদবদল সাধনের অভিযোগ তোলেন নি। নিঃসন্দেহে "মুছ্বহাফে'উছমান্" নামে পরিচিত কোরআন মজীদের সরকারীভাবে প্রচারিত কপিতে সামান্যতম বিকৃতি বা রদবদল ঘটলেও বিদ্রোহীরা এটাকেই খলীফাহ্ 'উছমানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অপরাধ হিসেবে তুলে ধরতেন, কিন্তু তাঁরা তা করেন নি। বরং ছ্বাহাবীদের সকলেই কোরআন মজীদের এ সরকারী কপি প্রচারে সহযোগিতা করেন।

পঞ্চমতঃ তৃতীয় খলীফাহ্র দ্বারা কোরআনে বিকৃতি সাধিত হয়ে থাকলে হযরত 'আলী ('আঃ) জনগণ কর্তৃক খলীফাহ্ নির্বাচিত হবার

পর অবশ্যই সর্বত্র থেকে "মুছ্বহাফে'উছমান্" ও তার অনুলিপিসমূহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করে দিতেন এবং তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) যুগে কোরআনের যে কপি লিপিবদ্ধ করেছিলেন তার অনুলিপি প্রচার করতেন। কিন্তু তিনি এমন কিছু করেন নি।

সুতরাং এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে "মুছ্বহাফে'উছমান্" ছিলো স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর রেখে যাওয়া কোরআন মজীদের হুবহু অনুলিপি।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, যে কোনো গ্রন্থই ব্যাপকভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে হাতে কপি করতে গিয়ে কিছু লোকের কপিতে কিছু ভুলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষ করে সর্বজনস্বীকৃত তথ্য অনুযায়ী তৎকালে শিক্ষার সীমাবদ্ধতার কারণে নবী করীম (ছ্বাঃ) লোকদেরকে স্থানীয় উচ্চারণে কোরআন মজীদ পাঠ করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং পরে তার শ্রুতি অনুসরণে যখন অনেকে তা লিপিবদ্ধ করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর রেখে যাওয়া কপি থেকে কিছু পার্থক্য, বিশেষতঃ স্থানীয় উচ্চারণ অনুসরণজাত বানানের পার্থক্য ঘটা খুবই স্বাভাবিক ছিলো। এ কারণেই পরবর্তীকালে এ থেকে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে এবং স্থায়ীভাবে কোরআন মজীদের কপির বিশুদ্ধতার নিশ্চয়তা বিধানের পদক্ষেপ নেয়া হয় তথা কোরআনের সকল কপিকে মূল কপির অনুবর্তী করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। আর ছ্বাহাবীগণ যেহেতু কোরআন মজীদের বিশুদ্ধতা রক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন সেহেতু তাঁরা এর সরকারী কপির প্রচার এবং ত্রুটিপূর্ণ কপির সংশোধন ও প্রয়োজনে ধ্বংসসাধনের পদক্ষেপকে কেবল সমর্থনই করেন নি, বরং এর বস্তবায়নে সহায়তা করেন।

নোকতাহ্ ও ই'রাব্ সংযোজন মানে কি পরিবর্তন?

এটা অনস্বীকার্য যে, কোরআন মজীদ হচ্ছে মানবজাতির ইতিহাসে সর্বোচ্চ মুতাওয়াতির্ সূত্রে বর্ণিত ঐশী গ্রন্থ – যা থেকে কেবল এ গ্রন্থের রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) কর্তৃক

পেশকৃত গ্রন্থ হওয়াই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় না, বরং এ গ্রন্থ যে, সামান্যতম পরিবর্তন – এমনকি একটি বর্ণেরও পরিবর্তন – ছাড়াই আমাদের কাছে পৌঁছেছে তা-ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত। মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের দাবী এবং স্বয়ং কোরআন মজীদের বিভিন্ন উক্তি থেকেও প্রমাণিত যে, এ কোরআন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে লাওহে মাহফূয্ (সংরক্ষিত ফলক) নামক এক অবস্তুগত (মুজাররাদ্) সৃষ্টিতে যেভাবে সংরক্ষিত আছে মানুষের মাঝে প্রচলিত কোরআন হুবহু তারই লিখিত রূপ।

তবে বর্তমানে আমাদের মধ্যে কোরআন মজীদের যে লেখ্যরূপ প্রচলিত আছে তাতে মূল কোরআনের সাথে অতিরিক্ত চারটি জিনিস সংযোজিত হয়েছে – যা মূলতঃ পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে, বিশেষ করে অনারবদের পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে সংযোজন করা হয়েছে। এ চারটি জিনিস হচ্ছে : (ক) সূরাহ্ সমূহের লিখিত নাম এবং নাযিলের স্থান (মাক্কী-মাদানী) উল্লেখ, (খ) কতক বর্ণে নোকতাহ্ সংযোজন, (গ) বর্ণসমূহে হারাকাত চিহ্ন যোগ, বিশেষতঃ কতক শব্দের শেষ বর্ণে হারাকাত চিহ্ন – যা ই'রাব্ চিহ্ন হিসেবে পরিচিত, এবং (ঘ) কতক যতিচিহ্ন ও পাঠসৌন্দর্যের লক্ষ্যে বিভিন্ন সাঙ্কেতিক চিহ্ন যোগ। আর এ চারটি জিনিস যে পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয় এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোনোরূপ দ্বিমত নেই এবং এ ব্যাপারেও দ্বিমত নেই যে, এগুলো কোরআন মজীদের বক্তব্যে ও তাৎপর্যে সামান্যতম পরিবর্তন সাধন তো করেই নি, বরং একে সুরক্ষিত করেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কোরআন মজীদের সাথে ভালোভাবে পরিচয় নেই অন্তরে ব্যাধিগ্রস্ত এমন কতক লোক এগুলো সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে এবং বলতে চায় যে, যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর যুগে কোরআন মজীদে এগুলো ছিলো না সেহেতু এ কাজগুলো কোরআনে এক ধরনের পরিবর্তন সাধন করেছে।

এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, মূলের সাথে যে কোনো সংযোজনকে যখন স্থায়ীভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং সংযোজন হতে মূলকেও

আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় তখন তাকে বিকৃতি বলা চলে না। এটা অনেকটা তাফসীর লেখার ন্যায়। মূল কোরআনের পাশে বা নীচে যখন তার ব্যাখ্যা ও তাফসীর লেখা হয় তখন কেউ বলে না যে, এর দ্বারা মূল কোরআনের পাঠে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। কারণ, যে কেউ চাইলেই ব্যাখ্যা ও তাফসীরকে মূল কোরআন থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করতে পারে।

সূরাহ সমূহের শুরুতে সূরাহ গুলোর নাম যোগ করা হয় বিভিন্ন সূরাহকে পরস্পর থেকে আলাদা করার লক্ষ্যে। এ নামগুলো হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) থেকে বর্ণিত, কিন্তু এগুলো কোরআন মজীদের পাঠের অংশ নয়। এ কারণে কেউই কোরআন তেলাওয়াত্ করার সময় এ নামগুলো তেলাওয়াত্ করেন না। এ নামগুলো লেখার সুবিধা হচ্ছে এই যে, যেহেতু কোরআন মজীদে ১১৪টি সূরাহ্ রয়েছে সেহেতু যাদের পুরো কোরআন মুখস্ত নেই তাদের পক্ষে কোরআন মজীদের কোনো আয়াত ও সূরাহর নাম শুনেই সংশ্লিষ্ট সূরাহ্ ও আয়াতকে খুঁজে বের করতে পারার সম্ভাবনা কম। কারণ, সূরাহগুলোর নাম একেকটি সূরাহর পুরো বক্তব্যের প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং নামগুলো সূরাহকে চিহ্নিত করার মাধ্যম মাত্র। সূতরাং ব্যবহারিক সুবিধার জন্য সূরাহর নাম সংযোজনকে – যা তেলাওয়াত্ করা হয় না – কিছুতেই কোরআনে পরিবর্তন বলে গণ্য করা যায় না।

নোকতাহ্, হারাকাত্ ও ই'রাব্ চিহ্ন সংযোজন করা হয় মূলতঃ অনারব মুসলমানদের নির্ভুল তেলাওয়াতের সুবিধার্থে। কারণ, মূল আরবী ভাষায় কতক হরফের উচ্চারণ শব্দভেদে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আরবদের জন্য এতে সমস্যা হতো না। কারণ, তারা জন্মগতভাবে আরবী ভাষার পরিবেশে গড়ে ওঠার ফলে বুঝতে পারতো যে হরফটি কোন্ শব্দে কী রকম উচ্চারিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, মূল আরবী অনুযায়ী "সীন্" (س) হরফটি কোনো কোনো শব্দে বাংলা দন্ত্য স-এর মতো এবং কোনো কোনো শব্দে বাংলা তালব্য শ-এর মতো উচ্চারিত হয়। কিন্তু অনারবদের পক্ষে এর দু'ধরনের উচ্চারণস্থান নির্ণয় করা

সম্ভব ছিলো না বিধায় তাদের উচ্চারণে কতক ক্ষেত্রে ভুলের আশঙ্কা দেখা দেয়। এ কারণে যে সব ক্ষেত্রে "সীন্" (س) হরফটির উচ্চারণ তালব্য শ-এর মতো হবে সে সব ক্ষেত্রে এ হরফের ওপরে তিনটি নোকতাহ্ যোগ করা হয়। ফলে এ হরফটির একটি নতুন রূপ দাঁড়ায় ش। আরবরা "সীন্"-এর এ ধরনের দু'রকম লেখ্যরূপের মধ্যে প্রথমটিকে বলতো "সীনে মু'রাবাহ্" (سين معربة) অর্থাৎ "আরবীকৃত সীন্" এবং দ্বিতীয়টিকে বলতো "সীনে মু'জামাহ্" (سين معجمة) অর্থাৎ "'আজামীকৃত/ অনারবকৃত সীন্"। কিন্তু অনারবরা সহজায়নের জন্য উচ্চারণ অনুসরণে এ দু'টি হরফের নামকরণ করে যথাক্রমে "সীন্" ও "শীন"।

হারাকাত্ ও ই'রাব্ চিহ্নগুলোও অনারবদের সঠিক উচ্চারণের স্বার্থে সংযোজন করা হয়। কারণ, মূল আরবী ভাষায় স্বরচিহ্নের লিখিত রূপ ছিলো না; আরবরা অভ্যাসগত কারণে বুঝতে পারতো কোন্ শব্দের কোথায় কোন্ স্বরচিহ্ন উচ্চারিত হবে। অন্যদিকে আরবী ভাষায় বেশীর ভাগ শব্দেরই শেষ হরফে কোনো সুনির্দিষ্ট স্বরচিহ্ন থাকে না, বরং বাক্যমধ্যে শব্দের ভূমিকা অনুযায়ী তার শেষের স্বরচিহ্ন উচ্চারিত হয়; এ ধরনের পরিবর্তিত উচ্চারণ নির্দেশক ক্ষেত্রে স্বরচিহ্নকে ই'রাব্ বলা হয়। আরবরা অভ্যাসগত কারণে নির্ভুলভাবে এ সব স্বরচিহ্ন সহ বাক্যমধ্যে শব্দ উচ্চারণ করতো। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই অনারবরা এ ক্ষেত্রে ভুল করতো। এ কারণেই কোরআন মজীদে হারাকাত্ ও ই'রাব্-চিহ্ন যোগ করা হয়। (উল্লেখ্য, এখনো আরবরা সাধারণ লেখালেখিতে, যেমন : সাহিত্য ও অন্যান্য গ্রন্থে এবং সংবাদপত্রে) হারাকাত্ ও ই'রাব্-চিহ্ন ব্যবহার করে না, যদি না একান্ত ব্যতিক্রমী কোনো ক্ষেত্রে এবং অনারব শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে।

[এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা অত্যন্ত মশহূর। তা হচ্ছে কোরআন মজীদে হারাকাত্ ও ই'রাব্-চিহ্ন সংযোজনের আগে জনৈক অনারব কোরআন মজীদের আয়াত – أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ "অবশ্যই আল্লাহ্ মুশরিকদের থেকে নিঃসম্পর্ক এবং তাঁর

রাসূল-ও (নিঃসম্পর্ক)।"– এর শেষাংশের رَسُولُهُ (রাসূলুহ্)-কে رَسُولِهُ (রাসূলিহ্) পড়ছিলেন। ফলে আযাতটির অর্থ দাঁড়ায় : "অবশ্যই আল্লাহ্ মুশরিকদের থেকে নিঃসম্পর্ক এবং তাঁর রাসূল থেকেও (নিঃসম্পর্ক)।" এ কারণে কোরআন মজীদের কপিতে হারাকাত্ ও ই'রাব্-চিহ্ন যোগ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে বিশ্বের কোনো কোনো প্রাচীন গ্রন্থাগারে ও জাদুঘরে কোরআন মজীদের হারাকাত্ ও ই'রাব্-চিহ্ন ব্যবহার পূর্ববর্তী কপি, এমনকি নোকতাহ্ বিহীন কপিও সংরক্ষিত আছে।]

মোদ্দা কথা, সুস্থ বিচারবুদ্ধির অধিকারী কোনো লোকের পক্ষে এ সংযোজনগুলোকে কোরআন মজীদে বিকৃতি বা পরিবর্তন বলে গণ্য করতে পারেন না।

অনুরূপভাবে সূরাহ্ সমূহের মাক্কী বা মাদানী হওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে কোরআন মজীদের গবেষণামূলক ব্যবহারের সুবিধার্থে – যা পাঠ করা হয় না এবং এ নিয়ে মতপার্থক্য নেই। সুতরাং এগুলো বিকৃতি বা পরিবর্তন প্রমাণ করে না। একইভাবে আয়াতসংখ্যা উল্লেখ এবং আয়াত-নম্বর ও রুকূ'-নম্বর যোগ, পারা ও মঞ্জিল নির্দেশ ইত্যাদি যোগের বিষয়টিও একই ধরনের সুবিধার্থে – যা পাঠ করা হয় না এবং এগুলো বিকৃতি নির্দেশক নয়। অন্যদিকে দীর্ঘ মাদ্দ্ ও কতক পাঠচিহ্ন পাঠসৌন্দর্য বা অনারবদের নির্ভুল পাঠের স্বার্থে যোগ করা হয়েছে।

'বিসমিল্লাহ্' পাঠ নিয়ে বিতর্ক

এ বিষয়ে একটা আনুষঙ্গিক বিতর্ক এই যে, কোরআন মজীদের ১১৪টি সূরাহর মধ্যে সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ বাদে ১১৩টি সূরাহর শুরুতে যে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ রয়েছে তা সংশ্লিষ্ট সূরাহ্ সমূহের অংশ কিনা।

এ বিষয়ে ফক্বীহদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। ফক্বীহদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, যে যে সূরাহর শুরুতে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ রয়েছে সে সে ক্ষেত্রে তা সংশ্লিষ্ট সূরাহর অংশ এবং কোরআন

তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে যেমন ঐ সব بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ যথাস্থানে তেলাওয়াত্ করতে হবে ঠিক সেভাবেই নামাযে কোনো সূরাহ্ পড়ার সময় (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ বাদে) তা بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ সহ পাঠ করতে হবে।

অন্য একদল ফক্বীহ্ মনে করেন যে, সূরাহ্ সমূহের শুরুতে যে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ রয়েছে তার মধ্যে কেবল সূরাহ্ আল্-ফাতেহাহর শুরুতে তা ঐ সূরাহর অংশ, অন্যান্য সূরাহর শুরুতে তা সংশ্লিষ্ট সূরাহ্ সমূহের অংশ নয়। সুতরাং নামাযে ঐ সব সূরাহর শুরুতে তা পাঠ করতে হবে না। তাঁদের মতে, ঐ সব সূরাহর শুরুতে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ লেখা হয়েছে বিভিন্ন সূরাহকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেখানোর জন্য।

আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, সূরাহ্ আন্-নামল্-এর ভিতরে যে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ রয়েছে কেবল তা-ই কোরআন মজীদের অংশ; সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ বাদে সূরাহ্ আল্-ফাতেহাহ্ সহ অন্যান্য সূরাহর শুরুতে যে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ রয়েছে তার কোনোটিই ঐ সব সূরাহর অংশ নয়, বরং কোরআন তেলাওয়াত بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বলে শুরু করা যরূরী বিধায় সূরাহ্ আল্-ফাতেহাহর শুরুতে এবং বিভিন্ন সূরাহর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশের জন্য অন্যান্য সূরাহর শুরুতে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) স্বউদ্যোগে বা জিবরাঈলের পরামর্শে তা যোগ করেন।

কোরআন তেলাওয়াতের সময় সকল মুসলমানই কোরআন মজীদে লিখিত সবগুলো بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ যথাস্থানে তেলাওয়াত করে থাকেন। কিন্তু এ মতপার্থক্যের কারণে প্রথমোক্ত মতের অনুসারীরা নামাযে প্রতিটি সূরাহর শুরুতে (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ বাদে) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পাঠ করেন, দ্বিতীয় মতের অনুসারীরা নামাযে কেবল সূরাহ্ আল্-ফাতেহাহর শুরুতে তা পাঠ করেন এবং তৃতীয় মতের অনুসারীরা নামাযে কেবল প্রথম রাক্‘আতে সূরাহ্ আল্-ফাতেহাহর শুরুতে তা পাঠ করে থাকেন।

এ মতপার্থক্য সম্বন্ধে কেবল এতোটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, এ মতপার্থক্য হচ্ছে কোরআন মজীদের ব্যাখ্যা ও ব্যবহার সংশ্লিষ্ট মতপার্থক্য; এর সাথে কোরআন মজীদের অবিকৃত থাকা বা না-থাকার কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, এ ব্যাপারে কোনোরূপ মতপার্থক্য নেই যে, স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর নির্দেশে ১১৪টি সূরাহর মধ্যে ১১৩টির সূরাহর শুরুতে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ লেখা হয়েছে। সুতরাং এটা সন্দেহাতীত যে, কোরআন মজীদ তিনি যেভাবে রেখে গিয়েছেন তা সেভাবেই আছে; তাতে কোনো ধরনের রদবদল হয় নি।

যদিও কোরআন মজীদ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) যেভাবে রেখে গিয়েছেন ঠিক সেভাবেই আছে কিনা এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য ওপরের আলোচনাই যথেষ্ট এবং মুসলিম মনীষীদের মধ্যকার উপরোক্ত বিতর্কের সমাধান করা অপরিহার্য মনে না হতে পারে, কিন্তু যেহেতু কোরআন মজীদ নাযিল্ হয়েছে ‘ইলমী ও ‘ইবাদী ব্যবহারের জন্য সেহেতু এ বিতর্কের অবসানও অপরিহার্য বলে আমরা মনে করি এবং এ কারণে এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করছি।

যারা মনে করেন যে, কোরআন মজীদের ১১৪টি সূরাহর মধ্যে ১১৩টির সূরাহর শুরুতে যে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ লেখা হয়েছে তা এ সব সূরাহর বা অন্ততঃ সূরাহ্ আল্-ফাতেহাহ্ বাদে ১১২টি সূরাহর অংশ নয় তাঁদের এ মত ঠিক নয়, বরং সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ বাদে বাকী ১১৩টি সূরাহর ক্ষেত্রেই بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ এ সব সূরাহর অংশ। কারণ, সূরাহ্ সমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করাই যদি উদ্দেশ্য হতো তাহলে সে জন্য সূরাহ্ সমূহের শুরুতে ও/বা শেষে অন্য যে কোনো পার্থক্য নির্দেশক চিহ্ন বা সঙ্কেত বা শব্দ ব্যবহার করাই যথেষ্ট হতো, কোরআন মজীদেরই (সূরাহ্ আন্-নামল্-এর) একটি আয়াতকে এভাবে ব্যবহার করা হতো না।

এর পরেও আমরা যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেই যে, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ দুই সূরাহর পার্থক্য নির্দেশের জন্য লেখা হয়েছে তাহলে সূরাহ্ আত্-তাওবাহর শুরুতেও তা লেখা হতো এবং কোনো সূরাহর শুরুতেই তা তেলাওয়াত্ করা হতো না। আর যদি তা কেবল সূরাহ্ আল্-ফাতেহাহর শুরুতেই কোরআন মজীদের অংশ হতো তাহলে তা অন্য কোনো সূরাহর শুরুতে লেখা হতো না।

যারা মনে করেন যে, কোরআন তেলাওয়াতের জন্য যরূরী বিধায় এভাবে লেখা হয়েছে তাঁদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সে ক্ষেত্রে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর মৌখিক আদেশ ও আমলই যথেষ্ট হতো। এমনকি তা যদি সূরাহ্ আল্-ফাতেহাহর শুরুতেও এর অংশ না হতো তাহলে সেখানেও তা লেখা হতো না। بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বলে কোরআন তেলাওয়াত্ শুরু করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে গোটা উম্মাহর মধ্যে মতপার্থক্য নেই, যদিও তা কি ফরয/ওয়াজিব্ নাকি সুন্নাত্ তা ভিন্ন আলোচ্য বিষয়। সুতরাং কোনো সূরাহর মাঝখান থেকে তেলাওয়াত্ শুরু করলে যেভাবে সংশ্লিষ্ট স্থানে লেখা না থাকা সত্ত্বেও নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর আমল অনুসরণে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বলে তেলাওয়াত্ শুরু করা হয়, ঠিক সেভাবেই সূরাহর বা কোরআনের শুরু থেকে তেলাওয়াত্ করার ক্ষেত্রে সকলেই তা পড়ে তেলাওয়াত্ শুরু করতেন; সূরাহ্ সমূহের শুরুতে লেখার প্রয়োজন হতো না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোরআন মজীদের শুরু থেকে বা কোনো সূরাহর শুরু থেকে বা কোনো সূরাহর মাঝখান থেকে – তথা যেখান থেকেই তেলাওয়াত শুরু করা হোক না কেন তা اعوذ بالله من الشيطان الرجيم বলে শুরু করা অপরিহার্য। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

“অতএব, (হে রাসূল!) আপনি যখন কোরআন পাঠ করবেন তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান।” (সূরাহ্ আন্-নাহল্ : ৯৮)

এমতাবস্থায় হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) যদি কোরআন তেলাওয়াতের শুরু সংক্রান্ত হুকুম পালনের কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এবং সূরাহ্ সমূহের মধ্যকার পার্থক্য নির্দেশের জন্য কোনো কিছু যোগ করতে চাইতেন তাহলে প্রত্যেক সূরাহর শুরুতে اعوذ بالله من الشيطان الرجيم যোগ করাই হতো অধিকতর উত্তম। এমনকি সে ক্ষেত্রে সূরাহ্ আত্-তাওবাহর শুরুতে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ না লেখার যে কারণ সম্পর্কে সকলে একমত اعوذ بالله من الشيطان الرجيم লেখা হলে সে কারণ সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতো না।

এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন মজীদের ১১৪টি সূরাহর মধ্যে ১১৩টির শুরুতে যে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ লেখা হয়েছে তা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) নিজের পক্ষ থেকে বা জিব্রাঈলের ‘পরামর্শে’ লিপিবদ্ধ করান নি, বরং ঐ সূরাহগুলো بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ সহই নাযিল্ হয়েছে এবং তা ঐ সব সূরাহর প্রথম আয়াত বা প্রথম আয়াতের অংশ।

এ মতের বরখেলাফে কোনোই অকাট্য দলীল বর্তমান নেই।

কতক কপিতে শব্দগত পার্থক্যের অভিযোগ

কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো কোনো ছ্বাহাবীর নিকট কোরআন মজীদের যে নিজস্ব কপি ছিলো তাতে বর্তমানে প্রচলিত কোরআন মজীদ অর্থাৎ মুছ্বহাফে ’উছমান্ থেকে কতক শব্দের ও কতক শব্দের বানানে পার্থক্য ছিলো। এ ব্যাপারে ছ্বাহাবী উবাই বিন্ কা‘ব্-এর কপি সম্পর্কে বলা হয় যে, তাতে সূরাহ্ আল্-ফাতেহাহর و لا الضالين স্থলে غير الضالين লেখা ছিলো।

এ সম্বন্ধে বলতে হয় যে, যেহেতু এ সব বর্ণনা খবরে ওয়াহেদ্, সেহেতু এগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, যেভাবে সকল শীর্ষস্থানীয় ছ্বাহাবীর সহায়তাক্রমে সর্বত্র মুছ্বহাফে 'উছমান্ প্রচার করা হয়েছিলো এবং সকলকে নিজ নিজ কপি তার সাথে মিলিয়ে নিয়ে সংশোধনের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, আর এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিলো, এমতাবস্থায় কোনো ছ্বাহাবীর কপিতে তা থেকে কোনো শব্দগত পার্থক্য থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, ছ্বাহাবীরা যে কোরআন তেলাওয়াত করতেন তা কোনো গোপনীয় বিষয় ছিলো না, বিশেষ করে প্রত্যেক মুসলমানকে যেহেতু দৈনিক কয়েক বার নামাযে সূরাহ্ আল্-ফাতেহাহ্ পাঠ করতে হয় সেহেতু কারো পক্ষ থেকে و لا الضالين স্থলে غير الضالين পড়া ও তা গোপন রাখা সম্ভব ছিলো না, ফলে তাঁর মুছ্বহাফে কীরূপ লেখা ছিলো তা-ও গোপন থাকতো না। এমতাবস্থায় তাঁকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হতো এবং এ নিয়ে সংঘাতের সৃষ্টি হতো না। কিন্তু এ ধরনের কোনো বিরোধ-সংঘাতের কথা কোনো অকাট্য সূত্রেই জানা যায় না।

সুতরাং সর্বোচ্চ মুতাওয়াতির্ সূত্রে বর্ণিত গ্রন্থ কোরআন মজীদের মোকাবিলায় সন্দেহ সৃষ্টিকারী এ ধরনের দাবী সম্বলিত খবরে ওয়াহেদ্ বর্ণনাকে আদৌ সত্য বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বরং এ ধরনের বর্ণনাসমূহ যে ইসলামের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট মিথ্যা ছিলো এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

ক্বিরাআতে বিভিন্নতার প্রশ্ন

অনেকে কোরআন মজীদের সাত, দশ বা ততোধিক বিখ্যাত পাঠ বা তেলাওয়াৎকেও কোরআনের অবিকৃত থাকার ওপর সংশয় সৃষ্টিকারী বলে মনে করেন। এ প্রশ্নটি তোলা হয় বিষয়টি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে।

কোরআন মজীদের সাত, দশ বা ততোধিক বিখ্যাত পাঠ (তেলাওয়াত্)-এর উদ্ভব হয় কোরআন নাযিল্ ও গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার এবং অভিন্ন কপি প্রচারিত হওয়ার অনেক পরে। আর এ বিষয়টি প্রায়

পুরোপুরি তেলাওয়াতের সৌন্দর্যের সাথে সম্পৃক্ত; এর সাথে কোরআন মজীদের পাঠ (text)-এর কোনোই সাংঘর্ষিকতা নেই। অন্যদিকে তেলাওয়াত্‌-সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে এ ধরনের বিভিন্ন পাঠের উদ্ভাবন এক ধরনের ইজতিহাদী বিষয় – যার কোনোটিকেই গ্রহণ করা অপরিহার্য নয় এবং এর বাইরেও যে কেউ যে কোনোভাবে তেলাওয়াত্‌ করতে পারে, কেবল শর্ত এই যে, কোরআন মজীদের পাঠ (text)-এ কোনো রকমের হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে না, দীর্ঘ ও স্বল্পবিরতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাকরণিক বিষয়গুলো মেনে চলবে এবং অর্থে যাতে পরিবর্তন না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখবে।

কতক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত পাঠসমূহের উদ্ভাবকগণের মধ্যে কদাচিৎ কতক ক্ষেত্রে বর্ণ ও শব্দ সংক্রান্ত মতপার্থক্য ছিলো। আসলে এ ধরনের মতপার্থক্য আদৌ ছিলো কিনা তা নিশ্চিত নয়। কারণ, এ সব বর্ণনা মিথ্যাও হতে পারে। এমনকি এ সব বর্ণনা সত্য হলেও তাতে কিছুই আসে যায় না। কারণ, ছ্বাহাবীদের যুগ থেকে সর্বসম্মতভাবে চলে আসা মুছ্বহাফে ‘উছমানের কোনো শব্দ বা বর্ণের ব্যাপারে পরবর্তীকালে কেউ ভিন্নমত পোষণ করে থাকলে (সত্যিই যদি কেউ করে থাকেন) তার যে কোনোই মূল্য নেই তা সুস্থ বিচারবুদ্ধির অধিকারী যে কেউই স্বীকার করতে বাধ্য।

অন্যদিকে তাঁদের মধ্যে হারাকাত, ই‘রাব্‌ ও যতির ব্যাপারেও কদাচিৎ মতপার্থক্য হয়েছে, কিন্তু তাতে কোরআন মজীদের মূল পাঠে (যাতে এগুলো ছিলো না) কোনোই পার্থক্য ঘটছে না। এরূপ ক্ষেত্রে যথাযথ ‘ইলমী যোগ্যতার অধিকারীরা ব্যাকরণসম্মত ও সঠিক তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে এ ধরনের মতপার্থক্যের নিরসন করতে সক্ষম। অবশ্য হারাকাত, ই‘রাব্‌ ও যতি সংক্রান্ত মতপার্থক্যগুলো খুবই গৌণ ও সংখ্যায়ও খুবই কম।

মতপার্থক্য যখন অকাট্যতার প্রমাণ

কোরআন মজীদের পাঠের বেলায় কতক ক্ষেত্রে হারাকাত, ই'রাব্ ও যতির ব্যাপারে যে মতপার্থক্য ঘটেছে – তাৎপর্যের দৃষ্টিতে যা নেহায়েতই গৌণ, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অতীতের কোরআন-বিশেষজ্ঞগণ এর নির্ভুল ও সুন্দরতম উচ্চারণ নিশ্চিতকরণ এবং তাৎপর্যের ক্ষেত্রে সামান্যতম দুর্বলতাকেও এড়াবার জন্য দারুণভাবে চেষ্টিত ছিলেন। এ কারণে তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তীদের দেয়া হারাকাত্ ও ই'রাবের সাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মতপার্থক্য করেছেন। এ মতপার্থক্যের ভিত্তি ছিলো এই যে, যেহেতু এগুলো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) থেকে আসে নি সেহেতু তাঁদের বিবেচনায় এগুলোতে কোনো দুর্বলতা থাকলে তা অবশ্যই সংশোধন করা উচিত। এ থেকে সুস্পষ্ট যে, যারা এহেন খুটিনাটি বিষয়ে এতো যত্নবান তাঁরা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) থেকে সর্বোচ্চ মুতাওয়াতির্ সূত্রে বর্ণিত কোরআন মজীদের মূল পাঠে সামান্যতম এদিক-সেদিক হওয়া থেকেও কতো সচেতন ছিলেন। আর এ সচেতনতা ও সতর্কতা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের হারাকাত্ প্রশ্নে মতপার্থক্য প্রসঙ্গে

অত্র গ্রন্থকারের জানামতে কোরআন মজীদের পাঠের ক্ষেত্রে হারাকাত্ সংক্রান্ত ভিন্নমতের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কেবল একটি হারাকাতের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আমলী তথা ফিক্বহী প্রশ্ন জড়িত। তা হচ্ছে ওযূর আয়াত। এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হবে তখন তোমরা তোমাদের চোহারাসমূহ ও হাতগুলো

কনুই পর্যন্ত ধৌত করো এবং তোমাদের মাথাগুলো মাসেহ্ করো ও পাগুলো টাখনু পর্যন্ত (মাসেহ্ করো)।” (সূরাহ্ আল্-মাএদাহ্ : ৬)

এখানে উক্ত আয়াতের ارجلكم শব্দের লাম (ل) হরফের হারাকাত্ নিয়ে মতপার্থক্য হয়েছে। অধিকাংশের মতে এর উচ্চারণ হবে “আরজুলাকুম্” এবং কতকের মতে এটির উচ্চারণ হবে “আরজুলেকুম্”। প্রথমোক্ত উচ্চারণ সঠিক গণ্য করলে পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে পায়ের গিরা (টাখনু) পর্যন্ত হাত টেনে পুরো পায়ের পাতা মাসেহ্ করতে হবে, আর দ্বিতীয়োক্ত উচ্চারণকে সঠিক গণ্য করলে পায়ের পাতার অগ্রভাগ থেকে টাখনুর দিকে হাত টেনে আংশিক মাসেহ্ করলেই যথেষ্ট হবে।

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এর সমাধান আদৌ কঠিন নয়। এখানে দু’টো উচ্চারণই ব্যাকরণসম্মত। কিন্তু যেহেতু মতপার্থক্য হয়েছে সেহেতু ইসলামী বিধিবিধান নির্ণয় সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি – সতর্কতার নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। তা হচ্ছে, পুরো পায়ের পাতাই মাসেহ্ করতে হবে। কারণ, এমনকি যদি আংশিক মাসেহ্ করারই হুকুম দেয়া হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রেও পুরো পায়ের পাতা মাসেহর মধ্যে উক্ত অংশ শামিল থাকায় এবং আংশিক নাকি পুরো এ ব্যাপারে সংশয় দেখা দেয়ায় পুরো পায়ের পাতা মাসেহ্ করলে ভুল হবে না।

এখানে উক্ত আয়াতের তাৎপর্য থেকে সুস্পষ্ট যে, উপরোক্ত “আরজুলাকুম্” ও “আরজুলেকুম্” উচ্চারণবিতর্কে পা ধোয়ার অথবা জুতা বা মোযার (যে ধরনের চামড়ার মোযার কথা বলা হয় তা আসলে এক ধরনের জুতা) ওপর মাসেহ্ করার হুকুমের অর্থ করার কোনোই সুযোগ নেই। কারণ, উক্ত আয়াতে দু’টি ক্রিয়াপদের আওতায় দু’টি বাক্য রয়েছে ও বাক্যদ্বয়ে দু’টি করে চারটি কর্ম রয়েছে এবং সংযোজক ওয়াও দ্বারা বাক্য দু’টিকে যুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে জুতা বা মোযা-র তো কোনো উল্লেখই নেই। উক্ত আয়াতে “আরজুলাকুম্” কর্মকে মাসেহ্ ক্রিয়াপদের আওতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধৌতকরণ ক্রিয়াপদের

অধীনে গণ্য করার কোনো সুযোগই নেই। কোরআন মজীদে বা আরবী সাহিত্যের অন্যত্র এভাবে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াপদকে উপেক্ষা করে কোনো কর্মের ওপর অন্য বাক্যস্থ ক্রিয়াপদের ক্রিয়া করার কোনো দৃষ্টান্ত আদৌ নেই। পা ধোয়ার হুকুমের সপক্ষে যে সব হাদীছ হাযির করা হয় রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর ওফাতের দুই শতাধিক বছর পরে সংকলিত সে সব খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছের কোনোই গ্রহণযোগ্যতা নেই।

অন্যদিকে কতক লোক হাতের চেয়ে পায়ে ধুলাময়লা বেশী লাগার যুক্তি দেখিয়ে ওযূর হুকুমের পিছনে মনগড়া কারণ নির্দেশ করে, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের কারণ বলেন নি। বস্তুতঃ ওযূর হুকুমের পিছনে স্রেফ্ আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য পরীক্ষা করা ছাড়া কোনো বস্তুগত কারণ নিহিত নেই। তা থাকলে তায়াম্মুম্ (যাতে চেহারায় ও হাতে মাটি তথা ধুলা লাগাতে হয়) ওযূ ও গোসলের বিকল্প হতে পারতো না। অবশ্য পা সহ শরীরের কোনো অংশে বাহ্যিক নাপাকী থাকলে ওযূ শুরু করার আগে অবশ্যই তা অপসারণ করে ও পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে, (বেশী ধুলাবালি ও কাদার ক্ষেত্রেও তা-ই করতে হবে,) অতঃপর ওযূ করতে হবে – যার শেষ রুকন্ হচ্ছে পা মাসেহ্ করা।

শেষ নবী (ছ্বাঃ) ও কোরআন মজীদের অপরিহার্যতা

ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে আল্লাহর মনোনীত নবী হিসেবে ও কোরআন মজীদকে আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করে না। সেই সাথে ইয়াহূদীরা হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)কেও নবী হিসেবে স্বীকার করে না। এ দু’টি ধর্মীয় জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে নবী-রাসূলগণের (‘আঃ) ও ঐশী কিতাবের অনুসরণকারী বলে দাবী করে থাকে। কিন্তু খৃস্টানরা বিগত প্রায় দুই হাজার বছর কালের মধ্যে এবং ইয়াহূদীরা আরো বেশীকালের মধ্যে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে কোনো নবীর আগমন ও কোনো আসমানী কিতাব্ নাযিলের দাবী ও প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনায় নেয় নি।

এমতাবস্থায় ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের জন্য বিচারবুদ্ধির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কতগুলো প্রশ্নের জবাব প্রদান করা অপরিহার্য বলে মনে করি। প্রশ্নগুলো হচ্ছে :

এক : হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)-এর পূর্বে বা তাঁর মাধ্যমে কি নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং মানুষের কাছে কি ঐশী প্রত্যাদেশের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ প্রত্যাদেশ ঐ সময়ই পৌঁছে গিয়েছিলো? পৌঁছে গিয়ে থাকলে তা কোথায়? ইয়াহূদীদের অনুসৃত বাইবেলের ‘পুরাতন নিয়ম’ অথবা খৃস্টানদের অনুসৃত ‘পুরাতন নিয়ম ও ইনজীল্’ হিসেবে দাবীকৃত বাইবেল্-ই কি সেই পূর্ণাঙ্গ ও সর্বশেষ ঐশী কিতাব্? যদি তা-ই হয়ে থাকে তো তাহলে ঐ দুই কিতাবে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ও ঐ দু’টি কিতাবের পূর্ণাঙ্গ ও সর্বশেষ ঐশী কিতাব্ হওয়ার কথা উল্লেখ নেই কেন? তাহলে সে গ্রন্থকে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তার মূল ভাষায় অবিকৃত ও সংরক্ষিত রাখা হয় নি কেন? তেমনি তা সংশ্লিষ্ট নবী বা নবীদের দ্বারা কিতাব্ হিসেবে সর্বজনীন বিচারবুদ্ধির কাছে প্রত্যয় সৃষ্টিকারী রূপে মুতাওয়াতির্ সূত্রে ও অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ্যতা সহকারে আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয় নি কেন? বিচারবুদ্ধির দাবী অনুযায়ী এটা কি সৃষ্টিকর্তার জন্য অপরিহার্য নয় যে, নবুওয়াতের ধারার পরিসমাপ্তি

ঘটানোর পর তিনি তাঁর পরিপূর্ণ পথনির্দেশকে যে কোনো প্রকার বিকৃতি ও সংশয়ের হাত থেকে রক্ষা করবেন?

দুই : নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকবে এবং মানবজাতির জন্য আর কোনো নবীর প্রয়োজনীয়তা না থাকবে তাহলে শেষ নবী কে? তিনি নিজেকে শেষ নবী হিসেবে ঘোষণা করেন নি কেন? করে থাকলে সে ঘোষণা কোথায়? তার প্রামাণ্যতাই বা কী? বাইবেলের 'পুরাতন নিয়ম' ও 'নতুন নিয়ম' এ উভয় অংশের বিভিন্ন পুস্তকে যে একাধিক মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা কি নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা হযরত 'ঈসা ('আঃ)-এর পূর্বে বা তাঁর মাধ্যমে সমাপ্ত না হওয়ার প্রমাণ বহন করে না? তাহলে বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে যাদের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা কা'র বা কা'দের সম্বন্ধে? খৃস্টানদের দাবী অনুযায়ী হযরত 'ঈসা ('আঃ) যে 'পারাক্লিতাস্'-এর আগমনের অগ্রিম সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছেন তা যদি তাঁর নিজের পুনরাগমন সম্পর্কে হয়ে থাকে (যদিও তা নয়, কারণ, তিনি 'আমি আসবো' বলেন নি) সে ক্ষেত্রে বিগত প্রায় দুই হাজার বছরেও তিনি আসেন নি কেন? এমতাবস্থায় এ দীর্ঘ সময়ের মানুষদের মধ্যে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের পথভ্রষ্টাতার দায়-দায়িত্ব কা'র?

তিন : হযরত 'ঈসা ('আঃ)-এর পূর্বে বা তাঁর মাধ্যমে যদি নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা শেষ না হয়ে থাকবে এবং ঐশী পথনির্দেশও যদি পূর্ণতাপ্রাপ্ত না হয়ে থাকবে, আর যে সব ঐশী পথনির্দেশ ঐ সময় পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছিলো তা-ও যখন মূল ভাষায় ও অবিকৃতভাবে বর্তমান নেই এমতাবস্থায় কি বিগত প্রায় দুই হাজার বছরেও কোনো নবীর আগমন ও কোনো ঐশী কিতাব্ নাযিল্ হওয়া অপরিহার্য ছিলো না?

মানুষের জন্য কোনো অবিকৃত ঐশী পথনির্দেশ মওজূদ থাকবে না অথচ সৃষ্টিকর্তা প্রায় দুই হাজার বছরেও কোনো ঐশী পথনির্দেশ সহ কোনো নবীকে পাঠাবেন না – মানুষের প্রতি এহেন নির্দয়তা প্রদর্শন

করা কি পরম পূর্ণতার অধিকারী দয়াময় ও মেহেরবান সৃষ্টিকর্তার পক্ষে সম্ভব? ঐশী কিতাব্ বলে দাবী করে কোরআন-পূর্ববর্তী যে সব কিতাব্ পেশ করা হচ্ছে সেগুলোর অবস্থা যখন (প্রামাণ্যতার অভাব, মূল ভাষায় না থাকা, হ্রাস-বৃদ্ধি ও জঘন্যতার সংমিশ্রণের কারণে) এমন যে, সেগুলোকে ঐশী কিতাব্ বলে এবং সেগুলোতে নবী হিসেবে উল্লেখকৃত ব্যক্তিদেরকে নবী হিসেবে প্রত্যয়ের সাথে গ্রহণ করা সুস্থ বিচারবুদ্ধির পক্ষে সম্ভব হয় না এমতাবস্থায় নতুন পথনির্দেশ সহ কোনো নতুন নবীর আগমন ছাড়া মানবতার মুক্তির কোনো পথ থাকে কি?

অবশ্য খৃস্টানরা দাবী করে থাকে যে, খোদার পুত্র যীশূ [হযরত 'ঈসা ('আঃ)] তাঁর ভক্ত ও অনুসারীদের পাপের বোঝা কাঁধে তুলে নিয়ে শূলে মৃত্যুবরণ করে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। কিন্তু সুস্থ বিচারবুদ্ধির কাছে তাদের এ দাবী অগ্রহণযোগ্য, কারণ, তাদের এ দাবী (খোদার পুত্র থাকা) একেশ্বরবাদবিরোধী, অংশীবাদী, অযৌক্তিক, বিচারবুদ্ধিবিরোধী কুসংস্কারাচ্ছন্ন মিথ্যা দাবী। কারণ, খোদার পুত্র থাকার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারা তো দূরের কথা, তারা যেখানে যীশূ নামের কোনো ঐতিহাসিক ঐস্তিত্বকেই বিচারবুদ্ধির কাছে প্রত্যয় সৃষ্টিকারী প্রামাণ্য পন্থায় প্রমাণ করতে সক্ষম নয়, তখন তাঁর মাধ্যমে তাঁর ভক্ত-অনুসারীদের মুক্তির মতো আজগুবী দাবী কী করে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? বিশেষ করে তাদের এ দাবী অত্যন্ত বিপজ্জনক দাবী। কারণ, একজন মানুষ যতোই পাপাচারে নিমজ্জিত হোক, কেবল যীশূকে খোদার পুত্র বলে অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করলে এবং তাঁকে ভালোবাসলেই যদি মুক্তি পাওয়া যায় তাহলে দ্বীন-ধর্ম ও খোদার পক্ষ থেকে নবী প্রেরণের কোনো প্রয়োজন ও যৌক্তিকতাই থাকে না। মানুষ আক্ষরিক অর্থে এ বিশ্বাস পোষণ করলে মানুষের হাতে সমগ্র মানব প্রজাতি সহ এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতো।

এমতাবস্থায় বিগত প্রায় দুই হাজার বছরে অর্থাৎ খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝিকালের পরে কোনো সময় যদি ঐশী পথনির্দেশ সহ

কোনো নবী বা নবীগণ আগমন করে থাকেন তো তিনি বা তাঁরা কে বা কা'রা এবং তাঁর বা তাঁদের আনীত ঐশী পথনির্দেশ কোথায়?

অতএব, এটা নিঃসন্দেহ যে, হযরত 'ঈসা ('আঃ)-এর আগে বা তাঁর মাধ্যমে নবুওয়াত্ ও ঐশী পথনির্দেশ নাযিলের ধারা শেষ হয় নি। সুতরাং তাঁর পরে কেউ নবুওয়াতের দাবী করলে এবং ঐশী কিতাব্ বলে দাবী করে কোনো কিতাব্ পেশ করলে সে দাবী অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

এ ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, হযরত 'ঈসা ('আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সমুন্নত লোকে নীত হবার (এবং খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের মতে, নিহত হবার) পর বিগত প্রায় দু'হাজার বছরে যে সব ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করেছেন এবং ঐশী কিতাব্ হিসেবে দাবী করে নতুন কিতাব্ পেশ করেছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর মধ্যে নবীর গুণাবলী পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিলো এবং একমাত্র কোরআন মজীদেই পূর্ণতম ঐশী গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান রয়েছে।

সর্বজনস্বীকৃত অকাট্য ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) ছিলেন একজন নিরক্ষর ব্যক্তি – যিনি নবুওয়াত দাবী করার পূর্বে দীর্ঘ চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মক্কাহর জনগণের মাঝে বসবাস করেন এবং সেখানকার সকলের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সৎ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত থাকলেও জ্ঞানী, গুণী, দার্শনিক, সমাজসংস্কারক বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অথবা কবি, সাহিত্যিক, বাচনশিল্পী বা বাগ্মী কোনোটাই ছিলেন না। হঠাৎ করে চল্লিশ বছর বয়সকাল থেকে তিনি পরম জ্ঞানে পরিপূর্ণ কোরআন নামে এক কিতাব্ পর্যায়ক্রমিকভাবে উপস্থাপন করতে শুরু করলেন। কিন্তু তিনি নিজে এ কিতাব্ রচনার বাহাদুরী দাবী করলেন না, বরং এ কিতাবকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাব্ হিসেবে পেশ করলেন। এ কিতাব্ স্বীয় ঐশিতার দাবী প্রমাণের লক্ষ্যে এই বলে চ্যালেঞ্জ প্রদান করলো যে, লোকেরা যদি এ কিতাবকে মানুষের রচিত

বলে মনে করে তাহলে তারা যেন এর যে কোনো সূরাহ্র (এমনকি ক্ষুদ্রতম সূরাহর) সমমানসম্পন্ন একটি সূরাহ্ রচনা করে নিয়ে আসে এবং প্রয়োজনে এ কাজের জন্য দুনিয়ার সমস্ত মানুষের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করে। কিন্তু মধ্যম আয়তনের এ কিতাবখানির বক্তব্যের সংক্ষিপ্ততা, রচনাশৈলী, বাগ্মিতা, জ্ঞানগর্ভতা ও পথনির্দেশ এমনই অনন্য যে, আজ পর্যন্ত সে চ্যালেঞ্জ কেউ একক বা যৌথভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় নি।

এহেন ব্যক্তিকে নবী হিসেবে না মানা এবং এহেন কিতাবকে আল্লাহর কিতাব্ হিসেবে না মানা সুস্থ্ বিচারবুদ্ধির অধিকারী কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল অন্ধ বিদ্বেষ অথবা পার্থিব লাভ-লোভ ও প্রবৃত্তির দাসত্বই এ সত্য গ্রহণ করা থেকে কাউকে বিরত রাখতে পারে।

এ মহাগ্রন্থ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে শেষ নবী এবং নিজেকে সমগ্র মানবজাতির জন্য অনন্তকালীন পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ও সকল কিছুর পূর্ণ জ্ঞানের আধার (تبيانا لكل شيء) বলে উল্লেখ করেছে। অতএব, এ গ্রন্থের নাযিল্ সমাপ্ত হওয়ার ও হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নতুন ব্যক্তি নবুওয়াতের দায়িত্বে অভিষিক্ত হতে ও নতুন কোনো ঐশী কিতাব্ নাযিল্ হতে পারে না। এ কারণেই বিগত প্রায় চৌদ্দশ' বছরে যে সব ব্যক্তি নবুওয়াত্ দাবী করেছে এবং ঐশী কিতাব্ হিসেবে দাবী করে কিতাব্ পেশ করেছে, এমনকি অমুসলিম মনীষীদের নিকটও তাদের সে সব দাবী আদৌ বিবেচনাযোগ্য বলে পরিগণিত হয় নি।

এ প্রসঙ্গে মীর্যা গোলাম আহমদ কাদীয়ানীকে নবী হিসেবে গ্রহণকারী নিজেদের জন্য "আহ্মাদীয়াহ্" পরিচয় গ্রহণকারী ও মুসলিম উম্মাহর কাছে "কাদীয়ানী" নামে সমধিক পরিচিত ধর্মীয় গোষ্ঠীটির দাবীর অসারতার ওপর অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোকপাত করছি।

প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান সম্বলিত গ্রন্থ কোরআন মজীদ নাযিল্ হওয়ার পরে নতুন কোনো

পথনির্দেশক ওয়াহীর ও কোনো নতুন নবীর প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় কোনো নবী প্রেরণ ও কোনো পথনির্দেশক ওয়াহী নাযিল্ করা হবে একটি বাহুল্য কাজ। আর বলা বাহুল্য যে, পরম জ্ঞানময় আল্লাহ্ তা'আলা কোনো বাহুল্য কাজ করার মতো দুর্বলতা থেকে মুক্ত।

উল্লেখ্য যে, এখানে ওয়াহী বলতে আমরা পারিভাষিক অর্থে যে পথনির্দেশক ওয়াহী তা-কেই বুঝাচ্ছি – যা লোকদেরকে পথনির্দেশ প্রদানের লক্ষ্যে নবী-রাসূলগণের ('আঃ) নিকট নাযিল্ হতো এবং যা তাঁদের ওপর নবুওয়াতের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এ পারিভাষিক অর্থ ছাড়া "ওয়াহী" শব্দের যে সব আভিধানিক অর্থ রয়েছে, যেমন : প্রাণীকুলের সহজাত প্রবণতা, প্রত্যক্ষ অনুভূতি (intuition), স্বপ্নযোগে কোনো সত্য জানতে পারা বা কোনো সমস্যার সমাধান লাভ, হঠাৎ করেই কারো মনে কোনো কোনো সমস্যার সমাধান বা গূঢ় সত্য জাগ্রত হওয়া (ইলহাম্) ইত্যাদি – যা শুধু মু'মিনের বেলায়ই ঘটে না, অনেক সময় কাফেরের বেলায়ও ঘটে থাকে – তা আমাদের এখানকার আলোচ্য বিষয় নয়।

দ্বিতীয়তঃ কাদীয়ানীরা দাবী করে যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে যেহেতু কোরআন মজীদে "খাতামুন্নাবীয়্যীন্" অর্থাৎ 'নবীগণের সীলমোহর' বলা হয়েছে সেহেতু তাঁর মোহর ধারণ করে নতুন নবী আগমনের পথ খোলা রয়েছে। কিন্তু তাদের এ কথা দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর পরে নতুন কোনো নবীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা প্রমাণিত হয় না। কারণ, "হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) নবীগণের সীলমোহর" – এ কথার মানে হচ্ছে, তিনি যাদেরকে নবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন কেবল তাঁদের নবী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ধারণা বা ইয়াক্বীন পোষণ করতে হবে; এদের বাইরে কারো নবুওয়াত দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার কোনোই উপায় নেই।

অতএব, কোরআন মজীদে ও অকাট্যভাবে ছ্বহীহ্ হিসেবে প্রমাণিত হাদীছে যাদেরকে নবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা

নিঃসন্দেহে নবী। তাঁর পরে নবী হিসেবে আসবেন বলে কতক ব্যক্তির নাম-পরিচয় যদি কোরআন মজীদে উল্লেখ থাকতো বা তিনি বলে যেতেন তাহলে এ ধরনের ব্যক্তিদের আবির্ভাবের পর অবশ্যই তাদেরকে নবী বলে মানতে হতো। কিন্তু এমন কোনো নবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে না কোরআন মজীদে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, না হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে যান। সুতরাং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর পরে নতুন কোনো নবীর আবির্ভাবের প্রশ্নই ওঠে না।

কাদীয়ানীরা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর মোহর ধারণ করে নতুন নবী আগমনের অর্থ বলে দাবী করেছে যে, নতুন নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে নবী বলে স্বীকার করবেন। কিন্তু এটা একটা হাস্যস্কর অপযুক্তি। কারণ, এর দ্বারা নতুন নবুওয়াতের দাবীদার ব্যক্তি কর্তৃক হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর সীলমোহর ধারণ করা বুঝায় না, বরং নতুন নবুওয়াতের দাবীদার ব্যক্তি কর্তৃক হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর ওপর নবুওয়াতের স্বীকৃতিসূচক সীলমোহর প্রয়োগ করা বুঝায় – যা থেকে তিনি মুখাপেক্ষিতাহীন।

বস্তুতঃ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে নবী বলে স্বীকার করাই যদি কোনো ব্যক্তির নবুওয়াত-দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হতো তাহলে যে কোনো ভণ্ড-প্রতারকের জন্যই নবী সাজার পথ উন্মুক্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিচারবুদ্ধির নিকট এ ধরনের হাস্যস্কর অপযুক্তির বিন্দুমাত্র গ্রহণযোগ্যতা নেই।

মোদ্দা কথা, যেহেতু কোরআন মজীদের দাবী ও বিচারবুদ্ধির রায় অনুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা শেষ হয় নি এবং পূর্ণাঙ্গ, সর্বশেষ ও সংরক্ষিত ঐশী গ্রন্থ নাযিল্ হয় নি, অন্যদিকে তাঁর পরে বিগত প্রায় দেড় হাজার বছরে নবুওয়াতের দাবীদার কোনো ব্যক্তির দাবী ও উপস্থাপিত গ্রন্থ সর্বজনীন বিচারবুদ্ধি ও কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে বিবেচনাযোগ্য বলে পরিগণিত হয় নি, তেমনি স্বয়ং কোরআন মজীদ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে সর্বশেষ নবী এবং কোরআন মজীদকে সংরক্ষিত ও পরিপূর্ণ পথনির্দেশ সম্বলিত

ঐশী কিতাব্ হিসেবে দাবী করেছে, তেমনি কোরআনের কোনো সূরাহর সমমানসম্পন্ন কোনো নতুন সূরাহ্ রচনা কোনো মানুষ বা সকল মানুষের পক্ষেও সম্ভব হয় নি সেহেতু হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) ও কোরআন মজীদ সংক্রান্ত এ দাবী গ্রহণ করে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

দু'টি ভিত্তিহীন অভিযোগ

কোরআন-বিরোধীরা, বিশেষ করে খৃস্টান পণ্ডিত ও পাশ্চাত্য জগতের প্রাচ্যবিদগণ কোরআন মজীদের বিরুদ্ধে দু'টি অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে।

একটি অভিযোগ এই যে, কোরআন তার পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব্ সমূহের তেলাওয়াত্ বাতিল করে দিয়েছে এবং ঐ সব কিতাবের কতক বিধিবিধান পরিবর্তন করে দিয়েছে। তাদের মতে, কোরআন যদি আল্লাহর কিতাব্ই হবে তাহলে ইতিপূর্বে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল্কৃত কিতাব্ সমূহের তেলাওয়াত্ বাতিল ও কতক বিধান পরিবর্তন করবে কেন? তাদের দ্বিতীয় অভিযোগ হচ্ছে, কোরআনে কতক স্ববিরোধী কথা আছে; আল্লাহর কিতাব্ হলে তাতে স্ববিরোধী কথা থাকবে কেন?

তাদের উত্থাপিত প্রথম অভিযোগের দু'টি অংশ : পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের তেলাওয়াত্ বাতিল করা হলো কেন এবং কতক বিধানে পরিবর্তন সাধন করা হলো কেন?

বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে তাদের এ অভিযোগ বিবেচনাযোগ্য নয়। কারণ, প্রথমতঃ পূর্ববর্তী ঐশী কিতাব্ সমূহে একদিকে যেমন ব্যাপকভাবে বিকৃতি ঘটেছে – যা তারা নিজেরাও স্বীকার করতে বাধ্য, অন্যদিকে তা মূল ভাষায় বর্তমান নেই। ক্ষেত্রবিশেষে মূল ভাষা থেকে হারিয়ে যাবার পর অন্য ভাষার অনুবাদ থেকে পুনরায় মূল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সুতরাং মূল ভাষায় যেভাবে নাযিল্ হয়েছিলো সেভাবে না থাকায় এবং মূল ভাষায় থাকা বা না-থাকা প্রশ্নে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এবং কোনো কোনেটি যদি মূল ভাষায় বর্তমান থেকেও থাকে তথাপি সেগুলোতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল্কৃত কথার সাথে মানুষের

কথা মিশ্রিত হওয়ার ফলে ঐ সব কিতাবের কথাগুলো আর আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল্কৃত কথা নেই। সুতরাং সেগুলো আর পবিত্র ঐশী বাণী হিসেবে তেলাওয়াতযোগ্য নেই।

দ্বিতীয়তঃ ঐ সব কিতাবের বিকৃতি কেবল তার পাঠ (text)-এর পঠন-পাঠনের মধ্যেই ঘটে নি, বরং বিধি-বিধানের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। অন্যদিকে ঐ সব কিতাবের কোনোটিই স্থান ও কাল নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির জন্য নাযিল্ হয় নি, বরং মানবসভ্যতার বিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয় এবং তাদের জন্য নাযিল্কৃত কিতাব্ সমূহে কতক স্থায়ী বিধানের পাশাপাশি কতক বিধান শামিল করা হয়েছিলো একান্তভাবেই তাদের নিজস্ব ও সাময়িক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে। এছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর অপরাধের শাস্তি হিসেবে বা তাদের ঈমান ও আনুগত্য পরীক্ষার লক্ষ্যেও কতক বিধান নাযিল্ করা হয়েছিলো।

বলা বাহুল্য যে, স্থান ও কাল নির্বিশেষে ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় ঐশী বিধান হিসেবে সেগুলোর কোনোই কার্যকরিতা ছিলো না। অবশ্যঃ সন্দেহ নেই যে, ঐ সব গ্রন্থের সবগুলো ঐশী বিধানই স্থান-কাল ও গোষ্ঠীর জন্য নাযিল্কৃত সাময়িক বিধান ছিলো না এবং যে সব স্থায়ী বিধান ছিলো তার সবগুলোই যে বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো তা নয়; কতক বিধান অবশ্যই অবিকৃত অবস্থায় র'য়ে গিয়েছে। কিন্তু স্থান-কাল ও বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান হিসেবে কেবল ঐ বিধানগুলোই যথেষ্ট ছিলো না, বরং আরো অনেক বিধানের প্রয়োজন ছিলো। এমতাবস্থায় সামগ্রিক বিধানের গ্রন্থ হিসেবে ঐ সব গ্রন্থের ব্যবহার হতো এক ধরনের জটিলতা সৃষ্টিকারী কাজ এবং নতুন নাযিল্কৃত গ্রন্থের পাশাপাশি ঐ সব গ্রন্থের ব্যবহারের কোনোই উপযোগিতা ছিলো না। এ কারণেই ঐ সব গ্রন্থের স্থায়ী বিধানগুলোকে কোরআনের অন্তর্ভুক্ত করে পুনরায় নাযিল্ করা বা স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর বিধানিক আচরণের মাধ্যমে অব্যাহত রাখাই (যেমন : খাৎনাহর বিধান) যথেষ্ট ছিলো।

[স্মর্তব্য যে, কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) কোরআনের বাইরে যে সব নীতিগত, আইনগত বা শিক্ষণীয় তথা নবুওয়াতের দায়িত্বসংশ্লিষ্ট যে সব কথা বলতেন তার কোনোটিই তাঁর প্রবৃত্তি থেকে বলতেন না, বরং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল্কৃত ওয়াহী হিসেবে বলতেন – যাকে ওয়াহীয়ে গ্বায়রে মাৎলূ (পঠন-অযোগ্য ওয়াহী) বলা হয়।]

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব্ সমূহে প্রদত্ত বিভিন্ন বিধিবিধান এবং সে সব কিতাবের আয়াত্ ভুলিয়ে দেয়া বা সে সবের তেলাওয়াত রহিত করে দেয়ার বিরুদ্ধে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের উত্থাপিত আপত্তির জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

"আমি কোনো আয়াতকে তার চেয়ে অধিকতর উত্তম বা তার অনুরূপ (আয়াত্) আনয়ন ব্যতীত কোনো আয়াত্ রহিত করে দেই না বা ভুলিয়ে দেই না।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ১০৬)

এ প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থান-কাল নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য সর্বশেষ স্থায়ী বিধান দিতে গিয়ে পূর্ববর্তী কতক বিধিবিধানে রদবদল সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছি। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কতক বিধিবিধান হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কাজ বা বস্তুর প্রকৃতিগত অনিবার্য দাবী। এরূপ ক্ষেত্রে বিধান অপরিবর্তিত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ, যে সব কাজ বা খাদ্য-পানীয় মানুষের জন্য শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, চারিত্রিক বা আত্মিক ক্ষতি ডেকে আনে তা অবশ্যই হারাম হওয়া উচিত এবং এ কারণে প্রথম মানুষ হযরত আদম ('আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলের ('আঃ) শরী'আতেই তা হারাম ছিলো। যেমন : মিথ্যা বলা, চুরি-ডাকাতি, যেনা, নরহত্যা, মাদক দ্রব্য সেবন ইত্যাদি।

কিন্তু অন্য অনেক বিধানের ক্ষেত্রগুলো এমন যে, এ সব ক্ষেত্রে বিধানের জন্য কোনো প্রাকৃতিক মানদণ্ড নেই, ফলে স্থান-কাল

নির্বিশেষে অভিন্ন বিধান হওয়া অপরিহার্য নয়। এ সব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে কোনো বিধানকে স্থায়ীভাবেও দিতে পারেন, আবার চাইলে কোনো বিধানকে অস্থায়ীভাবেও দিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, ইবাদত-বন্দেগী সংক্রান্ত বিধি-বিধান – যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বান্দাহর আনুগত্য পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য। যেমন : 'ইবাদত দৈনিক কতো বার ও কোন্ নিয়মে করতে হবে তার কোনো প্রাকৃতিক মানদণ্ড নেই; আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে চান বান্দাহকে সেভাবেই তা আঞ্জাম দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন নবীর সময় বিভিন্ন ধরনের হুকুম দিলে তা তাঁর অধিকার।

অনুরূপভাবে সামাজিক বিধি-বিধান এবং অপরাধের শাস্তি বা দণ্ডবিধানেরও কোনো প্রাকৃতিক মানদণ্ড নেই। এ সব ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ যখন যেভাবে চান হুকুম দিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ্ তা'আলা যদি যেনার শাস্তি চাবুকের একশ' ঘা নির্ধারণ না করে দু'শ' বা পঞ্চাশ ঘা নির্ধারণ করে দিতেন তাহলেও কারো কিছু বলার ছিলো না।

এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে পরীক্ষা করার বা শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে অস্থায়ী বিশেষ বিধান নাযিল্ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বানী ইসরাঈলের জন্য শনিবারের বিধান ও চর্বি ভক্ষণ হারাম করার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কোরআনে স্ববিরোধিতা থাকার অভিযোগ

কোরআন-বিরোধীদের দাবী এই যে, কোরআনের কিছু বক্তব্য ও হুকুমের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা রয়েছে।

কোরআন-বিরোধীদের এ দাবী বড়ই বিস্ময়কর। কারণ, প্রকৃতই যদি কোরআন মজীদে কোনো ধরনের স্ববিরোধিতা থাকতো তাহলে কোরআন নাযিলের যুগের ইসলামের দুশমনরা তাকে কোরআনের ঐশী কিতাব্ হবার দাবীর বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করতো না। কারণ, কোরআন মজীদ স্বয়ং তাতে স্ববিরোধিতা

না থাকার বিষয়টিকে এর ঐশী গ্রন্থ হবার অন্যতম প্রমাণ হিসেবে দাবী করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا.

"তারা কি কোরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? তা যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে এসে থাকতো তাহলে অবশ্যই তাতে বহু স্ববিরোধিতা পাওয়া যেতো।" (সূরাহ্ আন্-নিসা' : ৮২)

এ ঘোষণার পর কাফেররা যদি কোরআন মজীদে কোনো স্ববিরোধিতা পেতো তাহলে তারা এ নিয়ে সমগ্র আরব উপদ্বীপে কোরআন-বিরোধী প্রচারের ঝড় তুলতো এবং সকলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হতো যে, কোরআন আল্লাহর কিতাব্ হওয়ার ও হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর নবী হওয়ার দাবী মিথ্যা। আর তারা তা আরবের বাইরেও ছড়িয়ে দিতো। কিন্তু এ ধরনের কোনো ঘটনার কথা কোনো সূত্রেই বর্ণিত হয় নি।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও অনেক পরবর্তীকালে কতক কোরআন-বিরোধী লোক, বিশেষ করে কতক খৃস্টান পণ্ডিত ও পশ্চিমা প্রাচ্যবিদের পক্ষ থেকে কোরআন মজীদে কিছু স্ববিরোধিতা দেখাবার চেষ্টা করা হয়।

[অত্র গ্রন্থের অত্র উপ-অধ্যায়টি 'আল্লামাহ্ সাইয়েদ আবূল্ ক্বাসেম্ খূয়ী (রহ্ঃ) প্রণীত *আল্-বায়ান্ ফী তাফিসরিল্ ক্বুরআন্* গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা হয়েছে যা মূলতঃ অত্র গ্রন্থকারের প্রণীত *কোরআনের মু'জিযাহ্* গ্রন্থের অংশবিশেষ। বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব দৃষ্টে এ অংশটি এখানেও যোগ করা হলো।]

তাদের দাবী অনুযায়ী কোরআনে কম পক্ষে দু'টি বিষয়ে স্ববিরোধী কথা রয়েছে যা কোরআনের ওয়াহী হওয়াকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। তা হচ্ছে :

(১) কোরআনের উক্তি অনুযায়ী হযরত যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহর কাছে পুত্রসন্তান কামনা করে দো'আ করেন। আল্লাহ্ তাঁর দো'আ কবূল্

করেন এবং দো‘আ কবূল্ হওয়ার নিদর্শন হিসেবে তাঁকে জানান যে, তিনি তিনদিন লোকদের সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলবেন না। এ কথা বুঝাতে গিয়ে কোরআন এক জায়গায় উল্লেখ করেছে :

قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا

“তিনি (আল্লাহ্) বললেন : তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন প্রতীকী ভাষায় ব্যতীত লোকদের সাথে কথা বলবে না।” (সূরাহ্ আলে ‘ইমরান : ৪১)

[অত্র আয়াতে উল্লিখিত رمز শব্দের অর্থ অনেকেই করেছেন ‘আকার-ইঙ্গিত’ অর্থাৎ তিনি মুখে কথা বলতে পারেন নি, বরং যাকে যা কিছু বলার তা ইশারা-ইঙ্গিতে বলেছেন। এ অর্থ গ্রহণ সঠিক বলে মনে হয় না, কারণ, মুখে কথা বলতে না পারাটা সকলের কাছে অসুস্থতার লক্ষণ। এমতাবস্থায় তা আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাঁর নবীকে প্রদত্ত মু‘জিযাহ্ (آية) হিসেবে গণ্য হতে পারে না। বস্তুতঃ رمز শব্দের অর্থ ‘আকার-ইঙ্গিত’ বা ‘ইশারা’। তবে এর মানে হাতের বা শারীরিক ‘আকার-ইঙ্গিত’ বা ‘ইশারা’ নয়, বরং ‘আকার-ইঙ্গিত’ বা ‘ইশারা’র ভাষা তথা রহস্যজনক ও প্রতীকী ভাষা যা বোঝার জন্য অনেক বেশী মাথা ঘামাতে হয়। এ ধরনের কথাবার্তা যে কোনো ব্যক্তির জন্য মর্যাদা বা গুরুত্বের পরিচায়ক। এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি সব সময় যে ধরনের ভাষায় কথাবার্তা বলেন তার পরিবর্তে তিনি হঠাৎ করে আকার-ইঙ্গিতবাচক বা রহস্যময় ভাষায় কথা বলা শুরু করলে সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায় যে, এটা তাঁর পক্ষে কী করে সম্ভব হলো! ফলে তাঁর মর্যাদা বা গুরুত্ব অনেক বেশী বেড়ে যায়। বিশেষ করে যে সব লোক ইঙ্গিতবাচক ভাষায় কথা বলতে সুদক্ষ তাঁরাও সারা দিনে হয়তো কয়েক বার এ ধরনের কথা বলেন; অনবরত এ ধরনের ভাষায় কথা বলা তাঁদের পক্ষেও সম্ভব নয়। কিন্তু হযরত যাকারিয়া (আঃ) তিন দিন এ ধরনের ইঙ্গিতবাচক বা প্রতীকী ভাষায় কথা বলেছেন। অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর যবানে এ ধরনের কথা জারী করে দেন – যা ছিলো একটি মু‘জিযাহ্ (آية)। অত্র আলোচনার ধারাবাহিকতায় পরে যে

আয়াত উদ্ধৃত হচ্ছে (সূরাহ্ মারইয়াম : ১০) তাতেও তিনি ‘স্বাভাবিক কথা’ বা ‘একভাবে কথা’ বলবেন না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে মনে হয়, তিনি এক এক সময় এক এক ধরনের বাকভঙ্গিতে ইঙ্গিতবাচক কথা বলেছিলেন। এছাড়া সূরাহ্ মারইয়াম-এর ১০ নং আয়াতে এর উল্লেখের পর পরই (১১ নং আয়াতে) তাঁকে, লোকদেরকে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা (তাসবীহ্) করার জন্য নির্দেশ সম্বলিত ওয়াহী জানিয়ে দিতে নির্দেশ দেয়ার কথা বলা হয়েছে যা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, ঐ তিন দিনের জন্য তাঁর কথা বলার ক্ষমতা স্থগিত হয়ে যায় নি।]

কিন্তু অন্যত্র একই প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতের বিপরীতে তিনি তিন রাত লোকদের সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলবেন না বলে উল্লেখ করা হয়েছে :

قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا.

“তিনি (আল্লাহ্) বললেন : তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন রাত স্বাভাবিক (বা একভাবে) কথা বলবে না।” (সূরাহ্ মারইয়াম : ১০)

আপত্তিকারীদের কথা হচ্ছে, উপরোক্ত দু’টি আয়াত পরস্পর বিরোধী। কারণ, দো‘আ কবুল হওয়ার নিদর্শন হিসেবে একটিতে তিন দিন এবং অপরটিতে তিন রাত স্বাভাবিক কথা না বলার উল্লেখ করা হয়েছে।

এ অভিযোগ আদৌ ঠিক নয়; অভিযোগকারীরা সম্ভবতঃ এ বিষয়ে সচেতন নন যে, আরবী ভাষায় يوم শব্দটি কখনো কখনো দিন অর্থাৎ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় বুঝাতে ব্যবহৃত হয় এবং সে ক্ষেত্রে তার বিপরীত অর্থ তথা রাত্রি অর্থাৎ সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় বুঝাতে ليل শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

سخرها عليهم سبع ليل و ثمانية ايام حُسوماً.

"তিনি তাদের ('আদ জাতির) ওপর সাত রাত ও আট দিনের জন্য তাকে (প্রবল বায়ু প্রবাহকে) বলবৎ করে দিলেন।" (সূরাহ্ আল্-হাকবক্কাহ্ : ৭)

এ আয়াতে يوم ও ليل পরস্পরের বিপরীত অর্থে ব্যহৃত হয়েছে।

কিন্তু আরবী ভাষায় কখনো কখনো يوم বলতে পুরো দিন ও রাত বুঝানো হয় । যেমন, কোরআন মজীদ এরশাদ হয়েছে :

و تمتعوا فى داركم ثلاثة ايام.

"আর তোমরা তিন দিনের জন্য (অর্থাৎ তিন দিন ও তিন রাত্রির জন্য) তোমাদের বাড়ীঘরে অবস্থানের সুবিধা ভোগ করে নাও।" (সূরাহ্ হূদ : ৬৫)

অনুরূপভাবে ليل শব্দটি কখনো কখনো সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

و الليل اذا يغشى.

"শপথ রাত্রির যখন তা (সব কিছুকে অন্ধকারে) আবৃত করে নেয়।" (সূরাহ্ আল্-লাইল্ : ১)

তেমনি ওপরে যেমন উদ্ধৃত করা হয়েছে :

سخرها عليهم سبع ليل و ثمانية ايام حُسوماً.

"তিনি তাদের ('আদ জাতির) ওপর সাত রাত ও আট দিনের জন্য তাকে (প্রবল বায়ু প্রবাহকে) বলবৎ করে দিলেন।" (সূরাহ্ আল্-হাকবক্কাহ্ : ৭)

কিন্তু কখনো কখনো ليل শব্দটি পুরো দিন-রাত্রি বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

و اذا واعدنا موسى اربعين ليلة.

"আর আমি যখন মূসাকে চল্লিশ রাত্রির জন্য (অর্থাৎ পর পর চল্লিশ দিন-রাত্রির জন্য) প্রতিশ্রুতি দিলাম।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ৫১)

বস্তুতঃ পুরো দিন-রাত বুঝাবার জন্য শুধু يوم বা শুধু ليل ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আরবী ভাষায় ভুরি ভুরি রয়েছে; কোরআন মজীদেও এর আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তসমূহ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, হযরত যাকারিয়া ('আঃ)-এর দো'আ কবুল হওয়া সংক্রান্ত উক্ত দু'টি আয়াতের মধ্যে প্রথমটিতে পুরো দিন-রাত্রি বুঝাতে ليل ব্যবহৃত হয়েছে এবং একইভাবে দ্বিতীয়টিতে পুরো দিন-রাত্রি বুঝাতে يوم ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, উক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে কোনোরূপ স্ববিরোধিতার অস্তিত্ব নেই। উক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে স্ববিরোধিতা তো নেই-ই, বরং আয়াতদ্বয় পরস্পরের ব্যাখ্যাকারী।

উল্লেখ্য, উভয় আয়াতেই যদি শুধু يوم অর্থে ব্যবহৃত হতো তাহলে কারো পক্ষে 'তিন দিন ও তিন রাত্রি' এবং কারো পক্ষে 'শুধু তিন দিন (রাত্রি নয়)' অর্থ গ্রহণ করার সুযোগ থাকতো। অনুরূপভাবে উভয় আয়াতে যদি শুধু ليل ব্যবহৃত হতো তাহলে কারো পক্ষে 'তিন দিন ও তিন রাত্রি' এবং কারো পক্ষে 'শুধু তিন রাত্রি (দিন নয়)' অর্থ গ্রহণ করার সুযোগ থাকতো। এমতাবস্থায় দুই আয়াতে দুই শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় তাৎপর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে আর কোনো মতপার্থক্যের সুযোগ থাকলো না।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে যারা স্ববিরোধিতা কল্পনা করেছে তারা يومকে শুধু 'সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত' অর্থে এবং অনুরূপভাবে ليلকে শুধু 'সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়' অর্থে গ্রহণ করেছে। অথচ উভয় শব্দেরই এতদভিন্ন অন্য অর্থও রয়েছে। তা হচ্ছে, উভয় শব্দেরই অন্যতম অর্থ 'পুরো দিন-রাত্রি'।

[অন্য অনেক ভাষায়ই 'দিন' ও 'রাত' শব্দদ্বয়ের এ ধরনের ব্যবহার প্রচলিত আছে। বাংলা ভাষায় 'দিন' বলতে 'সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়' এবং 'দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা' উভয়ই বুঝানো হয়। ফার্সী ভাষায় روز (দিন) ও شب (রাত)-এর ব্যবহার আরবী ভাষার অনুরূপ। যেমন, বলা হয় : دو شب آنجا بوديم – "আমরা দুই রাত

(অর্থাৎ দুই ‘দিন-রাত’) সেখানে ছিলাম।” ইংরেজী ভাষায়ও এ ধরনের প্রচলন রয়েছে। যেমন, বলা হয় : Hotel fare per night 100 dollar. – “হোটেল-ভাড়া প্রতি রাত (অর্থাৎ প্রতি ‘দিন-রাত’) একশ’ ডলার।” এখানে শুধু রাতের ভাড়া বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টার ভাড়া বুঝানোই উদ্দেশ্য।]

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, অন্যান্য ভাষার ন্যায় আরবী ভাষায়ও ‘দিন’ ও ‘রাত’-এর আরো অর্থ রয়েছে। তা হচ্ছে, বহুলব্যবহৃত অর্থে এক সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কে ‘দিন’, ‘সন্ধ্যা’, ‘রাত’, ও ‘প্রত্যুষ’ - এ কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়। এ ক্ষেত্রে সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ‘রাত’ বলা হয় না, বরং অন্ধকার ঘনিয়ে এলে ‘রাত’ শুরু হয় এবং ‘প্রত্যুষ’ (ছুব্‌হে ছ্বাদেক্ব) হওয়া পর্যন্ত ‘রাত থাকে বলে গণ্য করা হয়, তেমনি সূর্য দিগন্তের ওপরে উদিত হবার আগে চারদিক পুরোপুরি ফর্সা হয়ে গেলেই ‘দিন’ বলা হয়।

অতএব, উক্ত দুই আয়াতের মধ্যে স্ববিরোধিতার কল্পনা যে ভিত্তিহীন তা বলাই বাহুল্য।

এখানে আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ করা যেতে পারে। তা হচ্ছে, উক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে স্ববিরোধিতা থাকলে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর যুগের ইসলাম-বিরোধী আরবরা একে পুঁজি করে কোরআনের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতো। কিন্তু শব্দদ্বয়ের অর্থ সম্পর্কে অবগত থাকায় তারা প্রতিবাদ করে নি। এ থেকে আরো সুস্পষ্ট যে, আরবী ভাষায় যথাযথ জ্ঞান ছাড়াই বিরোধীরা কোরআন মজীদের বিরুদ্ধে হাস্যকর আপত্তি তুলেছে।

(২) তারা বলে : কোরআনে দ্বিতীয় যে স্ববিরোধিতা রয়েছে তা হচ্ছে, কোরআন কখনোবা মানুষের কাজের দায়-দায়িত্ব মানুষের ওপরই চাপিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ মানুষ স্বীয় ক্ষমতা ও এখতিয়ারের বলে কাজ করে থাকে বলে উল্লেখ করেছে।

[এ বিষয়ে অত্র গ্রন্থকারের *অদৃষ্টবাদ ও ইসলাম* গ্রন্থেও আলোচনা করা হয়েছে।]

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر.

"অতঃপর যে চায় সে ঈমান আনবে এবং যে চায় কাফের হবে।" (সূরাহ্ আল্-কাহফ্ : ২৯)

আবার কোথাও কোথাও কোরআন সমস্ত ক্ষমতা ও এখতিয়ার আল্লাহর হাতে সমর্পণ করেছে। এমনকি মানুষের কাজকর্মকেও আল্লাহর প্রতি আরোপ করেছে। যেমন, বলেছে :

و ما تشاؤن الا ان يشاء الله.

"তোমরা ইচ্ছা করবে না আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত।" (সূরাহ্ আল্-ইনসান্/ আদ্-দাহর : ৩০)

তাদের কথা : সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোরআনে কতোগুলো আয়াত রয়েছে যাতে আল্লাহর বান্দাহদেরকে তাদের কাজের ব্যাপারে এখতিয়ারের অধিকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যদিকে অপর কতগুলো আয়াতে মানুষকে এখতিয়ার বিহীন রূপে তুলে ধরা হয়েছে এবং সমস্ত কাজ আল্লাহর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। কোরআনের এ দুই ধরনের আয়াতের মধ্যে সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা বর্তমান – যা কোনো ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিরসন করা সম্ভব নয়।

এর জবাবে বলবো : কোরআন মজীদে যে কোথাও কোথাও বান্দাহদের কাজকে তাদের নিজেদের ওপর আরোপ করা হয়েছে এবং কোথাও কোথাও যে তা আল্লাহর প্রতি আরোপ করা হয়েছে – উভয়ই স্ব স্ব স্থানে সঠিক এবং এতদুভয়ের মধ্যে কোনোরূপ স্ববিরোধিতার অস্তিত্ব নেই। কারণ,

প্রতিটি মানুষই স্ব স্ব সহজাত অনুভূতি ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা এ সত্য অনুভব করে যে, সে কতোগুলো কাজ করার জন্য শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী এবং স্বাধীনভাবে ঐ সব কাজ করতে বা করা থেকে বিরত থাকতে সক্ষম। এ হচ্ছে এমন বিষয় মানবিক প্রকৃতি ও

বিচারবুদ্ধি যার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে। এ ব্যাপারে কেউ সামান্যতম সন্দেহও পোষণ করতে পারে না। এ কারণে বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানবান লোকই দুষ্কৃতিকারীকে তিরস্কার ও শাস্তি প্রদান করেন। এটাই প্রমাণ করে যে, মানুষ স্বীয় কাজকর্মে স্বাধীনতা ও এখতিয়ারের অধিকারী এবং কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য তাকে বাধ্য করা হয় না।

অন্যদিকে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিটি মানুষই লক্ষ্য করে থাকে যে, সাধারণভাবে পথ চলার সময় তার যে গতি তার সাথে উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাবার ক্ষেত্রে তার গতিতে পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য থেকে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, প্রথমোক্ত গতির ক্ষেত্রে সে স্বাধীন ও এখতিয়ার সম্পন্ন, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত গতির ক্ষেত্রে সে অনিচ্ছাকৃতভাবে বাধ্য।

বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আরো লক্ষ্য করে যে, যদিও সে কতোগুলো কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে স্বাধীন; সে চাইলে স্বেচ্ছায় সে কাজগুলো সম্পাদন করতে পারে এবং চাইলে স্বেচ্ছায় সে কাজগুলো করা থেকে বিরত থাকতে পারে, তথাপি তার এখতিয়ারাধীন এ সব কাজের অধিকাংশ পটভূমি বা পূর্বশর্তসমূহ তার এখতিয়ারের বাইরে। যেমন : মানুষের কাজের পটভূমি, তার আয়ুষ্কাল, তার অনুভূতি ও অনুধাবন ক্ষমতা, তার ঐ কাজের প্রতি আগ্রহ, তার অভ্যন্তরীণ চাহিদাসমূহের কোনো একটির জন্য কাজটি অনুকূল হওয়া এবং সবশেষে কাজটি সম্পাদনের শক্তি ও ক্ষমতা।

বলা বাহুল্য যে, মানুষের কাজের এই পটভূমিসমূহ তার এখতিয়ারের গণ্ডির বাইরে এবং এই পটভূমিসমূহের স্রষ্টা হচ্ছেন সেই মহাশক্তি যিনি স্বয়ং মানুষেরই স্রষ্টা।

অতএব, এ বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের কাজকর্মকে একই সাথে যেমন মানুষের প্রতি আরোপ করা চলে, তেমনি তা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিও আরোপ করা চলে যিনি এ কাজসমূহের সমস্ত পটভূমি সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ বিচারবুদ্ধির রায় এই যে, সৃষ্টিকর্তা সমস্ত সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করার পর নিজেকে কাজ থেকে গুটিয়ে নেন নি বা অবসর গ্রহণ করেন নি এবং সৃষ্টিলোকের পরিচালনা থেকেও হাত গুটিয়ে নেন নি, বরং সৃষ্টিলোকের অস্তিত্ব টিকে থাকা ও অব্যাহত থাকার বিষয়টি তাদের সৃষ্টির ন্যায়ই সৃষ্টিকর্তার শক্তি ও ইচ্ছার মুখাপেক্ষী। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ব্যতিরেকে সৃষ্টিলোকের পক্ষে এমনকি মুহূর্তের জন্যও টিকে থাকা সম্ভব নয়।

সৃষ্টিকর্তার সাথে প্রাণশীল ও প্রাণহীন নির্বিশেষে সৃষ্টিলোকের সৃষ্টিনিচয়ের সম্পর্ক একজন নির্মাতার সাথে তার নির্মিত ভবনের সম্পর্কের ন্যায় নয় যেখানে ভবনটি শুধু তার অস্তিত্বলাভের ক্ষেত্রে এর নির্মাতা ও শ্রমিকদের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু অস্তিত্ব লাভের পরে তাদের থেকে মুখাপেক্ষিতাহীন এবং এমনকি নির্মাতা ও শ্রমিকদের বিলয় ঘটলেও ভবনটি তার অস্তিত্ব অব্যাহত রাখতে পারে। তেমনি এ সম্পর্ক একজন গ্রন্থকারের সাথে তাঁর রচিত গ্রন্থের সম্পর্কের ন্যায়ও নয়, যেখানে গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রেই শুধু গ্রন্থকারের অস্তিত্বের প্রয়োজন, কিন্তু রচিত হয়ে যাবার পর গ্রন্থটির টিকে থাকা ও অস্তিত্ব অব্যাহত থাকার জন্য গ্রন্থকার, তাঁর হস্তাক্ষর ও তাঁর লিখনকর্মের আদৌ প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সৃষ্টিজগতের সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক যদিও সমস্ত রকমের উপমার উর্ধে তথাপি অনুধাবনের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে : সৃষ্টিজগতের সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক বৈদ্যুতিক বাতির আলোর সাথে বিদ্যুতের সম্পর্কের ন্যায়। বৈদ্যুতিক বাতি ঠিক ততোক্ষণই আলো বিতরণ করতে পারে যতোক্ষণ তারের মাধ্যমে বিদ্যুতকেন্দ্র থেকে বিদ্যুত এসে বাতিতে পৌঁছে। বস্তুতঃ বাতি তার আলোর জন্য প্রতিটি মুহূর্তেই বিদ্যুতকেন্দ্রের মুখাপেক্ষী; যে মুহূর্তে বিদ্যুতকেন্দ্র থেকে বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া দেয়া হবে, ঠিক সে মুহূর্তেই বাতি নিভে যাবে এবং আলোর স্থানে অন্ধকার আধিপত্য বিস্তার করবে।

ঠিক এভাবেই সমগ্র সৃষ্টিজগত স্বীয় অস্তিত্বলাভ, স্থিতি ও অব্যাহত থাকার জন্য তার মহান উৎসের মুখাপেক্ষী এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তার মহান উৎসের মনোযোগ (توجه) ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী। প্রতিটি সৃষ্টিই প্রতিটি মুহূর্তেই সে মহান উৎসের সীমাহীন দয়া ও করুণায় পরিবেষ্টিত হয়ে আছে; মুহূর্তের জন্যও যদি এ দয়া ও করুণার সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে সমগ্র সৃষ্টিনিচয় সাথে সাথেই অনস্তিত্বে পর্যবসিত হবে এবং সৃষ্টিলোকের আলো হারিয়ে যাবে।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, বান্দাহদের কাজ জাবর্ ও এখতিয়ারের মধ্যবর্তী একটি অবস্থার অধিকারী এবং মানুষ এ দুই দিকেরই সুবিধা পাচ্ছে।

جبر মানে 'বাধ্য করা'। এটি কালাম্ শাস্ত্রের একটি বিশেষ পরিভাষা। যারা جبر -এ বিশ্বাসী তারা সৃষ্টিকুলের সমস্ত কাজ স্রষ্টার প্রতি আরোপ করে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রধান মত হচ্ছে : (১) সৃষ্টির শুরুতে বা সৃষ্টিপরিকল্পনার মুহূর্তে সৃষ্টিকর্তা ভবিষ্যতের সব কিছু খুটিনাটি সহ নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং তদনুযায়ী সব কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে চলেছে। (২) প্রতি মুহূর্তে স্রষ্টা যা চান তার দ্বারা তা-ই করিয়ে নেন। (৩) প্রতিটি মানুষ (এবং অন্যান্য প্রাণীও) মাতৃগর্ভে আসার পর সৃষ্টিকর্তা তার ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করে দেন। (৪) প্রতি বছর একবার সৃষ্টিকর্তা গোটা সৃষ্টিকুলের, বিশেষতঃ মানুষের পরবর্তী এক বছরের ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করে দেন। [এ সব বিষয় নিয়ে অত্র লেখকের *অদৃষ্টবাদ ও ইসলাম* গ্রন্থে বিচারবুদ্ধি ও কোরআন মজীদের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।]

মানুষ কোনো কাজ সম্পাদন করা বা না করার ক্ষেত্রে স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতার ব্যবহারে পুরোপুরি স্বাধীন। কিন্তু তার এই শক্তি ও ক্ষমতা এবং কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত রকমের পটভূমি ও পূর্বশর্ত (مقدمات) তার নিজের নয়, বরং এগুলো সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তাকে দেয়া হয়েছে। এ সব কিছুর অস্তিত্বলাভের ব্যাপারে যেমন মানুষ সৃষ্টিকর্তার প্রতি মুখাপেক্ষী, তেমনি এ সবের স্থিতি ও অব্যাহত থাকার

ব্যাপারেও সে প্রতি মুহূর্তেই তাঁরই দয়া-অনুগ্রহ ও মনোযোগের মুখাপেক্ষী। সুতরাং মানুষ যে কাজই সম্পাদন করেছে এক হিসেবে তা তার নিজের প্রতি আরোপযোগ্য, আরেক হিসেবে তা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আরোপযোগ্য।

কোরআন মজীদের উক্ত আয়াত সমূহেও এ সত্যই তুলে ধরা হয়েছে। এ সব আয়াতে বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, স্বীয় কাজকর্মের ওপরে মানুষের শক্তি-ক্ষমতা ও এখতিয়ারের নিয়ন্ত্রণ তার কাজকর্মের ওপর খোদায়ী প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ, তিনিও মানুষের কাজকর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং মানুষের কাজকর্মে তাঁরও ভূমিকা রয়েছে।

বস্তুতঃ একেই বলা হয় امر بين الامرين (দু'টি অবস্থার মাঝামাঝি একটি অবস্থা)। [মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে চৈন্তিক দিক থেকে বিভিন্ন মত এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন মতের একটি সংমিশ্রিত রূপ বিরাজ করলেও বিশেষ করে আমলের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, তারা মানুষের কাজকর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে অবচেতনভাবে হলেও এ আক্বীদাহ্ই পোষণ করে।] আহলে বাইতের ইমামগণ ('আঃ)ও এ বিষয়টির ওপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং এ তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে 'জাবর্' ও 'তাফভীয্' – এ উভয় তত্ত্বকে বাতিল প্রমাণ করে দিয়েছেন।

[تفويض (অর্পণ) হচ্ছে কালাম্ শাস্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এর মানে হচ্ছে, মানুষকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে; সৃষ্টিকর্তা তার কাজকর্ম মোটেই নিয়ন্ত্রণ করেন না। একে اختيار (নির্বাচন/ বেছে নেয়া) তত্ত্বও বলা হয়। মু'তাযিলাহ্ ফির্ক্বাহ্ এ তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলো।]

এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী বিধায় আমরা এখানে আরো একটি সহজ উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পাঠক-পাঠিকাদের সামনে সহজবোধ্য করে তোলার প্রয়াস পাবো :

এমন এক ব্যক্তির কথা মনে করুন যার হাত দু'টি অকেজো, ফলে সে তার হাত দু'টি নাড়াচাড়া করতে এবং তা দ্বারা কাজকর্ম করতে পারে না। কিন্তু একজন চিকিৎসক একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে তার হাত দু'টিকে সচল ও সক্ষম করে দিলেন। ডাক্তার যখনই তার হাতে উক্ত যন্ত্র থেকে বিদ্যুত-তরঙ্গ সরবরাহ করেন তখন সে ইচ্ছা করলে তার হাত দু'টি নাড়াচাড়া ও তা দিয়ে কাজকর্ম করতে পারে এবং না চাইলে কিছু না করেও থাকতে পারে। কিন্তু যখনই ডাক্তার তার হাতের সাথে উক্ত যন্ত্রের সংযোগ ছিন্ন করে দেন বা তাতে বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ করে দেন তখন সে অক্ষম অবস্থায় ফিরে আসে এবং ইচ্ছা করলেও সে তার হাত দু'টি নাড়াচাড়া করতে পারে না।

এখন পরীক্ষা ও গবেষণার লক্ষ্যে ডাক্তার রোগীর হাত দু'টির সাথে উক্ত যন্ত্রটির সংযোগ প্রদান করলেন এবং রোগীও স্বীয় ইচ্ছা ও এখতিয়ার অনুযায়ী তার হাত দু'টি নাড়াচাড়া ও তা ব্যবহার করে কাজকর্ম করতে শুরু করলো। তার এ কাজকর্ম নির্বাচন ও তার শুভাশুভ পরিণতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে ডাক্তারের কোনো ভূমিকা নেই। কারণ, ডাক্তার তাকে এ সব কাজ করতে বা না করতে বাধ্য করে নি। বরং ডাক্তার যে কাজ করলেন তা হচ্ছে, তিনি রোগীকে কাজ করার শক্তি সরবরাহ করলেন এবং রোগীর পসন্দ মতো যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করলেন।

এখন এ ব্যক্তির হাত নাড়াচাড়া করা ও তা দ্বারা কাজকর্ম করাকে আমরা امر بين الامرين -এর দৃষ্টান্ত রূপে গণ্য করতে পারি। কারণ, তার এভাবে হাত নাড়াচাড়া ও কাজকর্ম করার বিষয়টি উক্ত যন্ত্র থেকে বিদ্যুত-তরঙ্গ সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল, আর এ বিদ্যুত-তরঙ্গ সরবরাহের বিষয়টি পুরোপুরি ডাক্তারের এখতিয়ারাধীন। অন্যদিকে ঐ ব্যক্তির হাত নাড়াচাড়া ও কাজকর্ম করাকে পুরাপুরিভাবে ডাক্তারের প্রতিও আরোপ করা চলে না। কারণ, ডাক্তার তাকে শুধু শক্তি সরবরাহ করেছেন, কিন্তু হাত নাড়াচাড়া ও তা দিয়ে কাজকর্ম রোগী স্বেচ্ছায়

সম্পাদন করেছে; রোগী চাইলে হাত নাড়াচাড়া ও তা দিয়ে কাজকর্ম করা থেকে বিরতও থাকতে পারতো।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে কাজকর্মের কর্তা রোগী একদিকে যেমন স্বীয় এখতিয়ারের বলে কাজকর্ম সম্পাদন করেছে এবং জাবর্ বা যান্ত্রিকতার শিকার হয় নি, তেমনি তার কাজকর্মের পুরো এখতিয়ারও তাকে প্রদান করা হয় নি, বরং সর্বক্ষণই তাকে অন্যত্র থেকে শক্তি ও সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে।

এটাই হচ্ছে لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين – "না জাবর্, না তাফভীয্, বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী একটি অবস্থা।" মানুষের সমস্ত কাজকর্ম এ অবস্থার মধ্য দিয়েই সংঘটিত হয়ে থাকে। একদিকে যেমন মানুষ স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী কাজকর্ম সম্পাদন করে থাকে, অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'আলা যার পটভূমি বা পূর্বশর্তাবলী তৈরী করে দেন তথা তিনি যা ইচ্ছা করেন তার বাইরে সে কোনো কিছু করতে বা করার ইচ্ছা করতে পারে না।

এতদসংক্রান্ত সমস্ত আয়াতের এটাই লক্ষ্য। অর্থাৎ কোরআন মজীদ একদিকে মানুষের জন্য এখতিয়ার প্রমাণ করে জাবর্-এ বিশ্বাসীদের চিন্তাধারার অসারতা প্রমাণ করেছে, অন্যদিকে মানুষের কাজকর্মকে আল্লাহর প্রতি আরোপ করে তাফভীয্-এর প্রবক্তাদের অভিমতকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছে।

* * *

কোরআন মজীদে নাসেখ্ ও মান্সূখ্

কোরআন মজীদের বিধিবিধানে স্ববিরোধিতার অভিযোগ

কোরআন-বিরোধীরা কোরআন মজীদের ঐশী কিতাব্ না হওয়ার দাবী করে এ গ্রন্থের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উত্থাপন করে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং সম্ভবতঃ সর্বাধিক গুরুতর অভিযোগ হচ্ছে এ গ্রন্থে বিভিন্ন স্ববিরোধী আহকামের উপস্থিতি। তাদের দাবী, কোরআনে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে একই বিষয়ে একাধিক হুকুম রয়েছে – যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন আল্লাহর কিতাব্ নয়।

এ অভিযোগটির বিশেষ গুরুত্ব এখানে যে, কোরআন মজীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অন্যান্য অভিযোগ খণ্ডনে অনেক ইসলাম-বিশেষজ্ঞ ও মুফাসসিরে কোরআন এগিয়ে এলেও এবং অভিযোগগুলো অকাট্যভাবে খণ্ডন করলেও এ অভিযোগটি খণ্ডনে কদাচিৎ কেউ এগিয়ে এসেছেন। বরং দু'একজন ব্যতিরেকে প্রায় সকল মুফাসসির ও ইসলাম-বিশেষজ্ঞই প্রকারান্তরে এ অভিযোগের যথার্থতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

কোরআন মজীদে এমন কতক আয়াত রয়েছে যাতে দেখা যায় যে, দৃশ্যতঃ একটি আয়াতে কোনো বিষয়ে একটি হুকুম নাযিল্ হয়েছে, কিন্তু অপর একটি আয়াতে একই বিষয়ে তা থেকে ভিন্ন হুকুম নাযিল্ হয়েছে। ওলামা ও মুফাসসিরীনে কোরআন এ ধরনের হুকুমসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হয়ে "নাসেখ্ ও মানসূখ্"-এর প্রবক্তা হয়েছেন। তাঁরা দাবী করেছেন যে, এ ধরনের হুকুমগুলোর মধ্যে একটি হুকুম দ্বারা অন্যটি মানসূখ্ বা রদ্ হয়েছে। এর ভিত্তিতে তাঁরা, তাঁদের দৃষ্টিতে, বহাল থাকা হুকুমটিকে নাসেখ্ (রহিতকারী) ও রদ্ হয়ে যাওয়া হুকুমটিকে মানসূখ্ (রহিতকৃত) হিসেবে অভিহিত করেছেন।

কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে নাযিল্কৃত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ আসমানী কিতাব্ – স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলা যা হেফাযতের অর্থাৎ অবিকৃত রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন; এটা আমাদের ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে কোরআন মজীদে আহ্‌কামের ক্ষেত্রে দৃশ্যতঃ যে সব স্ববিরোধিতা রয়েছে সে সম্পর্কে ওলামা ও মুফাসসিরীনে কোরআনের এ ব্যাখ্যা মুসলমানরা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে। কিন্তু এ জবাব কোরআন-বিরোধীদের আপত্তিকে খণ্ডন করতে সক্ষম হয় নি।

বিষয়টির এহেন গুরুত্ব বিবেচনায় এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

নাসেখ্-মানসূখের ভিত্তি ও প্রকরণ

ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, স্বয়ং কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে আয়াত মানসূখ্ করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ করেন :

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

“আমি কোনো আয়াতকে তার চেয়ে অধিকতর উত্তম বা তার অনুরূপ (আয়াত্) আনয়ন ব্যতীত রহিত করে দেই না বা ভুলিয়ে দেই না।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ১০৬)

ইতিপূর্বে আমরা আমাদের আলোচনায় বলেছি যে, এ আয়াতে মূলতঃ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের পাঠ রহিতকরণ ও অনেক বিধান রহিতকরণ বা পরিবর্তনকরণের বিরুদ্ধে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু দু’একজন ব্যতিক্রম বাদে প্রায় সকল মুফাসসির্ ও ইসলামী মনীষীই এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করেছেন এবং এ আয়াতের লক্ষ্য কোরআন মজীদের অভ্যন্তরে নাসেখ্ ও মানসূখ্ বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে, কোরআন মজীদের অভ্যন্তরে দুই ধরনের নাসেখ্ ও মানসূখ্ কার্যকর হয়েছে :

এক ধরনের নাসেখ্ ও মানসূখ্ হচ্ছে এই যে, এক সময় কোনো হুকুম সম্বলিত কোনো আয়াত নাযিল্ হয়েছে, কিন্তু পরে তার তেলাওয়াত্ মানসূখ্ হয়ে গিয়েছে, ফলে কোরআন মজীদের লিখিত পাঠে আর তা বর্তমান নেই, কিন্তু তার হুকুম বহাল রয়ে গিয়েছে। আরেক ধরনের নাসেখ্ ও মানসূখ্ হচ্ছে এই যে, এক সময় কোনো বিষয়ে একটি হুকুম সম্বলিত আয়াত নাযিল্ হয়েছে, পরে একই বিষয়ে ভিন্ন হুকুম সম্বলিত অন্য আয়াত নাযিল্ হয়েছে এবং এর ফলে প্রথমোক্ত আয়াতটির হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার তেলাওয়াত্ বহাল রয়েছে।

অন্যদিকে ব্যতিক্রম হিসেবে যে দু'একজন মুফাসসির্ ও ইসলাম-গবেষক উপরোক্ত মতের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন তাঁদের মতে, কোরআন মজীদের না কোনো আয়াতের পাঠ (তেলাওয়াত্) রহিত হয়েছে, না কোনো আয়াতের হুকুম রহিত হয়েছে। বিশেষ করে কোনো আয়াতের তেলাওয়াত্ মানসূখ্ হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের মত হচ্ছে এই যে, কোরআন নাযিল্ সমাপ্ত হবার পর থেকে বিগত প্রায় দেড় হাজার বছর পর্যন্ত বিশ্বের মুসলমানদের নিকট যে অভিন্ন কোরআন মজীদ রয়েছে তার বাইরে কোনো কিছু কোরআনের আয়াত হিসেবে কখনোই নাযিল্ হয় নি, অতএব, এরূপ কোনো আয়াতের তেলাওয়াত্ মানসূখ্ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

অন্যদিকে যারা কোরআন মজীদের আয়াতের তেলাওয়াত্ বা হুকুম মানসূখ্ হওয়া সম্ভব বলে মনে করেন তাঁরা বেশ কিছু সংখ্যক আয়াতের হুকুমকে মানসূখ্ গণ্য করেন। ফলে যারা সংশ্লিষ্ট হুকুমগুলোকে মানসূখ্ গণ্য করেনে না তাঁদের ও এদের মধ্যে ঐ সব আয়াতের তাৎপর্য গ্রহণ ও শর'ঈ হুকুম বয়ানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা যায়। আর বিষয়টি যেহেতু কেবল চিন্তা ও 'আক্বীদাহর সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং বাস্তব আচরণ ও আমলের সাথে জড়িত সেহেতু এ বিষয়টি নিয়ে গভীর ও যথাসম্ভব বিস্তারিত পর্যালোচনা করে নির্ভুল উপসংহারে উপনীত হওয়া অপরিহার্য প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

আয়াত্ ও আহ্কামের নাসখের সম্ভাব্যতা

আয়াত্ ও আহ্কামের মানসূখ্ হওয়ার সম্ভাব্যতার বিষয়টি দু'টি পর্যায়ে আলোচনার দাবী রাখে। প্রথমতঃ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠাবার পর থেকে শুরু করে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল্কৃত সকল আয়াত্ ও আহ্কাম্ আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যার মধ্যে কোরআন মজীদও শামিল রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ বিশেষভাবে কোরআন মজীদ আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় ইয়াহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিতদের মত হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার নাযিল্কৃত আয়াত্ ও আহ্কাম্ মানসূখ্ বা রহিত হওয়া সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে তাঁদের যুক্তি হচ্ছে এই যে, আয়াত্ ও আহ্কাম্ রহিতকরণ বা তাতে পরিবর্তন সাধন আয়াত্ নাযিল্কারী ও বিধানদাতার দুর্বলতার পরিচায়ক। কারণ, তা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও ভ্রান্তি নির্দেশ করে। আর আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের দুর্বলতা থেকে মুক্ত।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত্ ও আহ্কামের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের ধারণার অস্পষ্টতার ওপর তাঁদের এ যুক্তি প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির নিকট যে ওয়াহী নাযিল্ করেছেন তা মানুষের ভাষায়ই নাযিল্ করেছেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর ওয়াহী সমুন্নততম ভাবসমৃদ্ধ হলেও মানুষের নিকট অবতরণের ক্ষেত্রে তা সংশ্লিষ্ট ভাষার সীমাবদ্ধতার দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। অন্যদিকে বিভিন্ন ভাষার প্রকাশক্ষমতার মধ্যে যেমন পার্থক্য দেখা যায় তেমনি একই ভাষার বিকাশেরও বিভিন্ন স্তর দেখা যায়।

এ প্রসঙ্গে আরো স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াহী, আয়াত্ বা কিতাব্ মানুষের কাছে পৌঁছলে যে 'নাযিল্' হওয়া অর্থাৎ অবতরণ করা বা নীচে নামা বলা হয় তার মানে বস্তুগত অর্থে উঁচু স্থান থেকে নীচু জায়গায় নেমে আসা নয়, বরং এ অবতরণ

গুণগত, ভাবগত ও তাৎপর্যগত। অর্থাৎ পরম প্রমুক্ত অসীম সত্তা আল্লাহ্ তা'আলার ভাব যখন সসীম সত্তা বিশিষ্ট মানুষের অর্থাৎ নবী-রাসূলগণের (আঃ) নিকট পৌঁছে তখন তা স্বাভাবিকভাবেই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতার বৈশিষ্ট্য লাভ করে এবং যখন তা মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা হয় তখন তা আরো সীমাবদ্ধতা লাভ করে। এ ক্ষেত্রে মানগত ও তাৎপর্যগত যে অবনতি ঘটে তা-ই হচ্ছে 'নুযূল্' (অবতরণ)।

এমতাবস্থায় একই ভাষায় খোদায়ী ওয়াহী ভাষাটির বিকাশের প্রাথমিক স্তরে নাযিল্ হওয়ার পর তার বিকাশের উন্নততর স্তরে পুনরায় নাযিল্ হওয়া ও পূর্ববর্তী সংস্করণ রহিত হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, ভাষার প্রকাশক্ষমতার উন্নততর স্তরে এসেও প্রাথমিক স্তরের ভাষায় খোদায়ী আয়াত্ বা কিতাব্ বিদ্যমান থাকলে তার ভাষাগত নিম্নমান মানুষের মনে আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশক্ষমতা সম্বন্ধে অথবা সংশ্লিষ্ট বক্তব্যের ওয়াহী হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। অন্যদিকে একই কারণে উন্নততম প্রকাশক্ষমতাসম্পন্ন ভাষার বিকাশের চরমতম পর্যায়ে সে ভাষায় খোদায়ী ওয়াহী বা কিতাব্ নাযিল্ হওয়ার পর ঐশী কিতাবের অন্যান্য ভাষায় নাযিল্কৃত পূর্ববর্তী সংস্করণসমূহ রহিত হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

এ ধরনের নাসখ (রহিতকরণ) দুইভাবে হতে পারে : পূর্ববর্তী আয়াত্ ও কিতাব্ সমূহে বিকৃতি সাধিত হওয়া বা মূল ভাষা থেকে হারিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তথা মানবিক গতিধারায় অথবা পরবর্তীতে নাযিল্কৃত আয়াত্ বা কিতাবের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে অথবা উভয় পন্থায়। আমরা প্রথম পন্থাটিকে প্রাকৃতিক পন্থা নামে অভিহিত করতে পারি।

দ্বিতীয় পন্থায় রহিতকরণের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে একটি সমস্যা দেখা দিতে পারে। তা হচ্ছে, পরবর্তীতে নাযিল্কৃত ওয়াহীকে 'ওয়াহী' বলে যাদের অন্তরে প্রত্যয় সৃষ্টি না হবে তারা পূর্ববর্তী ওয়াহীকে মানসূখ্ (রহিত) বলে মানবেন না। অতএব, এ ক্ষেত্রে

প্রথম পন্থাই হচ্ছে নিশ্চিতভাবে কার্যকর পন্থা। আর এটা অকাট্য সত্য যে, প্রথম পন্থায় কোরআন মজীদের পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব্ সমূহ রহিত হয়ে গেছে। কারণ, নিশ্চিতভাবেই ঐ সব কিতাব্ মূল ভাষায় বর্তমান নেই; বিদ্যমান (অনূদিত বা ভাষান্তরিত) প্রতিটি কিতাবেই ব্যাপকভাবে বিকৃতি প্রবেশ করেছে ও প্রতিটিরই একাধিক সংস্করণ আছে। এমনকি যে সব নবী-রাসূলের ('আঃ) নামে ঐ সব কিতাব্ প্রচলিত আছে তাঁরাই যে ঐ সব কিতাব্ উপস্থাপন করেছিলেন এটা প্রত্যয় উৎপাদনকারী মানবিক পন্থায় প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ সংশ্লিষ্ট নবীর ('আঃ) সময় থেকে মুতাওয়াতির্ সূত্রে তা বর্ণিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করা সম্ভব নয়। অ্যদিকে কোরআন মজীদ যে ঐ সব নবী-রাসূলের ('আঃ) নিকট সংশ্লিষ্ট কিতাব্ সমূহ নাযিল্ হওয়ার কথা বলেছে তাকে এ ক্ষেত্রে দলীল হিসাবে পেশ করা যাবে না। কারণ, তা মানবিক দলীল নয়। এ দলীলকে দলীল হিসাবে ব্যবহার করতে হলে কোরআন মজীদকে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব্ হিসাবে স্বীকার করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে ঐ সব কিতাবের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও কোরআন মজীদের বক্তব্য মেনে নিতে হবে। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ববর্তী কিতাব্ সমূহ মানসূখ্ হয়েছে প্রাকৃতিকভাবেই এবং কোরআন মজীদও তা মানসূখ্ হবার কথা বলেছে।

অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ উভয় পন্থায়ই মানসূখ্ হয়েছে।

এবার আসা যাক আহকাম্ প্রসঙ্গে।

ইয়াহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিতদের দাবী হচ্ছে, যেহেতু বিধানদাতা তাঁর দুর্বলতার বা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণেই বিধানে পরিবর্তন করেন, অতএব, খোদায়ী বিধানে পরিবর্তন হতে পারে না। (তাঁদের এ যুক্তি মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে পূর্বতন কিতাব্ সমূহ রহিত হলেও নতুন কিতাবে পূর্বতন বিধানসমূহই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।)

তাঁদের পক্ষ থেকে এ যুক্তি উপস্থাপনের কারণ হচ্ছে, তাঁরা বিভিন্ন ধরনের বিধানের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিদানে ব্যর্থ হয়েছেন।

সকল আহকাম্ বা বিধিবিধানকে আমরা এক বিবেচনায় দুই ভাগে ভাগ করতে পারি : অপরিহার্য ও আপেক্ষিক। অপরিহার্য বিধিবিধান হচ্ছে মানুষের সৃষ্টি-প্রকৃতির দাবী, অতএব, তাতে পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। নৈতিক বিধিবিধান এবং মানুষের জন্য শারীরিক, মানসিক বা নৈতিক দিক থেকে ক্ষতিকর এমন খাদ্যবস্তু ও কাজকে হারামকরণ এ পর্যায়ভুক্ত।

অন্যদিকে যে সব বিধিবিধান নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক কারণ বিদ্যমান নেই, বরং বিধানদাতার ইচ্ছাই তার একমাত্র নিয়ামক সে সব বিধিবিধানকে আমরা সামগ্রিকভাবে আপেক্ষিক বিধিবিধান বলে অভিহিত করতে পারি। এর মধ্যে কতগুলো বিধিবিধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে আনুগত্য পরীক্ষা করা। 'ইবাদত-বন্দেগীর বিধিবিধান এ পর্যায়ের। এর কোনো অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক মানদণ্ড নেই, বরং বিধানদাতা যে কোনো হুকুম জারী করে বান্দাহর আনুগত্য পরীক্ষা করতে পারেন। তাই তিনি চাইলে পূর্ববর্তী হুকুম রহিত করে নতুন হুকুম জারী করতে পারেন।

এ পর্যায়ের অন্যান্য বিধিবিধানের লক্ষ্য হচ্ছে পার্থিব জীবনে মানুষের জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করা। এতে স্থান, কাল, পরিস্থিতি ও পাত্রভেদে সর্বোচ্চ কল্যাণের মানদণ্ড বিভিন্ন হতে পারে।

এ ক্ষেত্রে বিধানদাতার পক্ষ থেকে তিন ধরনের প্রক্রিয়ার কথা চিন্তা করা যায় : হয় তিনি মানবজাতির সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিধান শুরুতেই প্রদান করবেন, অথবা প্রতিটি নতুন পরিস্থিতি উদ্ভবের সাথে সাথে নতুন বিধান পাঠাবেন ও যে বিধানের পরিস্থিতি বিলুপ্ত হয়েছে সে বিধান বিলোপ করবেন, অথবা এমন কিছু মূলনীতি ও পথনির্দেশ প্রদান করবেন যার ভিত্তিতে মানুষ স্থান, কাল, পরিস্থিতি ও পাত্রভেদে প্রয়োজনীয় বিধান উদঘাটন করবে।

আমরা সামান্য চিন্তা করলেই বুঝতে পারি যে, প্রথম প্রক্রিয়াটি বাস্তবসম্মত নয়। কারণ ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল অবস্থার সকল মানুষের জন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রের বিস্তারিত বিধান প্রণয়ন করা হলে তা হতো এতোই ব্যাপক যে, বিশেষ করে প্রাথমিক যুগের মানুষের পক্ষে তার মধ্য থেকে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিধানসমূহ খুঁজে বের করা সম্ভব হতো না। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি যুক্তিসঙ্গত হলেও মানবসভ্যতার বিকাশ, মানবজাতির ব্যাপক বিস্তৃতি ও জীবনযাত্রার জটিলতার যুগে এ প্রক্রিয়া মানুষের জন্য তেমন একটা উপযোগী হতো না। কারণ, সে ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বে সর্বক্ষণ বহু নবীর মাধ্যমে নতুন নতুন বিধান জারী ও পুরনো বিধান রহিতকরণের বিষয়টি এতোই ব্যাপক আকার ধারণ করতো যে, তাতে মানুষ দিশাহারা হয়ে পড়তো। তাছাড়া নবীকে নবী হিসাবে চিনতে পারা-নাপারা ও স্বীকার করা-নাকরার ভিত্তিতে এ জটিলতা মারাত্মক আকার ধারণ করতো। অন্যদিকে মানবজাতি প্রথম দিকে জ্ঞান ও সভ্যতার বিচারে যে পর্যায়ে ছিলো তাতে তাদের পক্ষে তৃতীয় প্রক্রিয়া থেকে উপকৃত হওয়া অর্থাৎ মূলনীতি ও পথনির্দেশের সহায়তায় বিস্তারিত বিধান উদঘাটন করা সম্ভব ছিলো না।

এমতাবস্থায় যা স্বাভাবিক তা হচ্ছে, (১) মানবজাতির বিকাশ-বিস্তারের একটি পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিকট এবং প্রয়োজনে যুগে যুগে বিস্তারিত বিধিবিধান প্রেরণ, পুনঃপ্রেরণ এবং তাতে প্রয়োজনীয় রদবদল ও সংশোধন, (২) অতঃপর মানবজাতির বিকাশের একটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে স্থায়ীভাবে কতক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান প্রদান যাতে মানুষের বিভিন্ন অবস্থার বিবেচনা থাকবে এবং কতক ক্ষেত্রে মূলনীতি ও পথনির্দেশ প্রদান – যার ভিত্তিতে স্থান, কাল, পরিস্থিতি ও পাত্র বিবেচনায় বিস্তারিত বিধান উদঘাটন করা হবে।

বিভিন্ন ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ ও নবী-রাসূলগণের ('আঃ) ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, প্রকৃত পক্ষে এরূপই হয়েছে। যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে নবী-রাসূলগণের ('আঃ) আগমন ঘটেছে। তাঁদের মাধ্যমে অপরিবর্তনীয় বিধিবিধানের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট

জাতির জন্য বিস্তারিত আপেক্ষিক বিধিবিধানও নাযিল্ হয়েছিলো, তবে তার কার্যকারিতা ছিলো সুনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। অতঃপর হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) এর মাধ্যমে চিরস্থায়ী বিধিবিধান নাযিল্ হয় – যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর ও অপরিবর্তিত থাকবে। তবে পূর্ববর্তী বিধিবিধানের সাথে এ সব বিধিবিধানের বৈশিষ্ট্যগত প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এতে একদিকে যেমন বিস্তারিত বিধিবিধানে মানুষের বিভিন্ন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, অন্যদিকে মানবজীবনের অনেকগুলো বিরাট ক্ষেত্রের জন্য বিস্তারিত বিধানের পরিবর্তে মূলনীতি ও দিকনির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

আমাদের এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, সাময়িকভাবে বিধিবিধান জারী করা এবং পরে তা রহিত করে স্থায়ী বিধিবিধান জারী করায় মহান বিধানদাতার প্রজ্ঞা ও বান্দাহদের প্রতি তাঁর কল্যাণেচ্ছারই প্রকাশ ঘটেছে।

এখানে আরো দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব্ সমূহের প্রামাণ্যতাই যেখানে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং কার্যতঃ যেখানে প্রাকৃতিকভাবেই ঐ সব কিতাব্ মানসূখ্ হয়ে গেছে সেখানে ঐ সব কিতাবের বর্তমান বিকৃত সংস্করণসমূহে যে সব বিধিবিধান রয়েছে সেগুলো যে মূল কিতাবের বিধান এবং তা পরিবর্তিত, বিকৃত ও সংযোজিত নয় – তার নিশ্চয়তা কোথায়? এমতাবস্থায় কোরআনের বিধানের সাথে তার যে পার্থক্য তা কি পূর্ববর্তী বিধানের রহিতকরণনির্দেশক, নাকি বিকৃতিনির্দেশক সে প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে পূর্ববর্তী কতক বিধান যে রহিত করা হয়েছে তা কোরআন মজীদ থেকেই জানা যায়। আর তা যে সম্ভব এবং বিধানদাতার প্রজ্ঞার পরিচায়ক তা আমরা প্রমাণ করেছি।

দ্বিতীয়তঃ খোদায়ী বিধান পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের নিকট বিদ্যমান বর্তমান গ্রন্থাবলীতেও রয়েছে। যেমন : বাইবেলের 'পুরাতন নিয়ম'-এর 'গণনা পুস্তক'-এর ৪র্থ অধ্যায়ের ১-৩ নং পদে লেভী-বংশীয়দের মধ্যকার তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বছর

বয়স্কদের জন্য সমাগম তাঁবুতে সেবাকর্ম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু একই পুস্তকের ৮ম অধ্যায়ের ২৩-২৫ নং পদে এ কাজের জন্য ২৫ থেকে ৫০ বছর বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ধরনের আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। সুতরাং, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের পক্ষে নাসখ্ অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

অতএব, কোরআন মজীদ নাযিলের পর্যায়ে পূর্ববর্তী কিতাব্ সমূহ মানসূখ্ হয়ে যাওয়ার মধ্যেই মানবতার কল্যাণ নিহিত ছিলো। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সব কিতাব্ মানসূখ্ হওয়ার ব্যাপারে আহলে কিতাবের আপত্তির জবাবে এরশাদ করেন :

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

"আমি অধিকতর উত্তম বা অনুরূপ কিছু পেশ না করে কোনো আয়াৎকে রহিত করি না বা ভুলিয়ে দেই না।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ১০৬)

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, পূর্ববর্তী কিতাব্ সমূহের বক্তব্যসমূহ সমমানে বা অধিকতর উত্তম মানে কোরআন মজীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং যে সব বিধিবিধান ও দিকনির্দেশ তাতে ছিলো না অথচ বর্তমানে বা ভবিষ্যতে প্রয়োজন তা-ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পূর্ববর্তী কিতাব্ সমূহে এমন অনেক বক্তব্য রয়েছে যা সংক্ষেপেও কোরআন মজীদে স্থান পায় নি; এর কি ব্যাখ্যা থাকতে পারে? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে এ সত্যটি স্মরণ করতে হবে যে, পূর্ববর্তী কিতাব্ সমূহের কোনোটিই নাযিল্কালীনরূপে অবিকৃতভাবে বিদ্যমান নেই।

ঐ সব কিতাবের প্রায় সবগুলোতেই আল্লাহর কালামের সাথে সংশ্লিষ্ট নবী-রাসূলের ('আঃ) কথা ও কাজের বর্ণনা এবং গ্রন্থসংকলকদের নিজেদের বক্তব্য যোগ করা হযেছে। ঐ সব গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে যে কারো নিকটই তা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। বস্তুতঃ কোরআন মজীদ যে অর্থে আল্লাহর কিতাব্ সে অর্থে ঐ সব কিতাবকে কিছুতেই আল্লাহর কিতাব্ বলা চলে না, বরং ঐ সব

কিতাবকে নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর জীবনীগ্রন্থের সাথে তুলনা করা চলে যা অ-নবী লেখক কর্তৃক রচিত, তবে তাতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের কিছু আয়াত্ ও কিছু হাদীছ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কোরআন মজীদ যখন নাসখের কথা বলেছে তখন মূল কিতাবের কথাই বলেছে এবং নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী মূল কিতাবসমূহের চিরস্থায়ী গুরুত্বের অধিকারী সব বক্তব্যই কোরআন মজীদে স্থান পেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরো স্মরণ করা যেতে পারে যে, কোরআন মজীদ 'ভুলিয়ে দেয়া'র কথা বলে প্রাকৃতিক পন্থায় নাসখের কথা বলেছে। একই সাথে সরাসরি 'নাসখ্'-এর কথা বলা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী কিতাব্ সমূহ হারিয়ে গেলেও (ব্যাপক বিকৃতি অর্থে) সে সব কিতাবের ব্যাপক বিকৃতির কারণে ঐ সব আয়াতের কার্যকারিতা অব্যাহত রাখার পরিবর্তে অনুরূপ বা তার চেয়ে উত্তম নতুন আয়াত্ পেশ করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত ছিলো।

কোরআনের আয়াত্ মানসূখ্ হওয়া সম্ভব কি?

আমরা আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করেছি যে, ওলামায়ে ইসলামের বিরাট অংশ মনে করেন যে, কোরআন মজীদের আয়াত্ (অর্থাৎ আয়াতের তেলাওয়াত্ বা হুকুম বা উভয়ই) মানসূখ্ হওয়া সম্ভব। তাঁরা এ মতের সপক্ষে যে দলীল উপস্থাপন করেন তা হচ্ছে ইতিপূর্বে উল্লিখিত আয়াত্ :

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

"আমি অধিকতর উত্তম বা অনুরূপ কিছু পেশ না করে কোনো আয়াতকে রহিত করি না বা ভুলিয়ে দেই না।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ১০৬)

কিন্তু আমাদের মত হচ্ছে এই যে, এ আয়াতে পূর্ববর্তী কিতাব্ সমূহ মানসূখ্ হওয়া প্রসঙ্গে আহলে কিতাবের আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে; এতে কোরআন মজীদের কোনো আয়াত্ মানসূখ্ হবার কথা

বলা হয় নি। এর পূর্ববর্তী আয়াত্ ও পরবর্তী কয়েক আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়্লেই তা সুস্পষ্ট ধরা পড়্বে। এরশাদ হয়েছে :

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ. أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

“আহলে কিতাবের মধ্যকার যারা কাফের হয়ে গিয়েছে তারা ও মোশরেকরা পসন্দ করে না যে, তোমাদের ওপরে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কোনো কল্যাণ নাযিল্ হোক। আর আল্লাহ্ তো যাকে ইচ্ছা করেন স্বীয় রহমত প্রদান করেন। আর আল্লাহ্ অনুগ্রহের অধিকারী ও পরম সুমহান। বস্তুতঃ আমি অধিকতর উত্তম বা অনুরূপ কিছু পেশ না করে কোনো আয়াত্ রহিত করি না বা ভুলিয়ে দিই না। তুমি কি জানো না আল্লাহ্ সব কিছুরই ওপর ক্ষমতাবান? তুমি কি জানো না আসমান সমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই? আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের জন্য কোনো অভিভাবক বা অপরাজেয় শক্তি নেই। তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সে ধরনের প্রশ্ন করতে চাও ইতিপূর্বে যেভাবে মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো? আর যে ঈমানের বিনিময়ে কুফরী গ্রহণ করে সে তো গোমরাহীর পথে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে উপনীত হলো। আহলে কিতাবের নিকট সত্য সমুদ্ভাসিত থাকার পরেও তাদের অনেকেই হিংসাবশতঃ কামনা করে যে, তোমাদের ঈমান আনার পরেও যদি তোমাদেরকে কুফরীতে ফিরিয়ে নিতে পারত! অতএব, আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে ক্ষমা করো ও তাদের

সাথে বিবাদ এড়িয়ে চলো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল কিছুর ওপর শক্তিমান।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ১০৫-১০৯)

এ আয়াত্ সমূহ থেকে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা‘আলা এখানে আহলে কিতাবের পক্ষ হতে মু’মিনদেরকে ইসলাম থেকে কুফরীতে ফিরিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এই অপচেষ্টার প্রক্রিয়া কী ছিলো? এখানে সুস্পষ্ট যে, তারা অপযুক্তির আশ্রয় নিয়ে কোরআনের ওপর মুসলমানদের ঈমানে সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করতো। তাদের অন্যতম অপযুক্তি ছিলো এই যে, কোরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সত্যতা স্বীকার করেছে, অন্যদিকে সে সব কিতাবের পঠন-পাঠন ও ব্যবহার-অনুসরণ রহিত করে দিয়েছে; এটা কি সম্ভব যে, আল্লাহর কিতাব্ আল্লাহ্ তা‘আলারই নাযিল্কৃত অন্য কিতাবকে রহিত করে দেবে? পূর্ববর্তী নবীদের সময় তো এমনটি হয় নি। অতএব, এই ব্যক্তি [হযরত মুহাম্মদ (ছ্বাঃ)] আল্লাহর নবী হতে পারেন না এবং এই কিতাব্ (কোরআন মজীদ) আল্লাহর কিতাব্ হতে পারে না।

এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাদের সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূর করার জন্য পূর্ববর্তী কিতাব্ সমূহ রহিত করার যৌক্তিকতা বর্ণনা করা প্রয়োজন ছিলো। অন্যথায় আগে ও পরে আহলে কিতাবের হিংসা ও অপচেষ্টার কথা বলতে গিয়ে মাঝখানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে কোরআনের এক আয়াত্ দ্বারা অন্য আয়াত্ মানসূখ্ করার কথা উল্লেখ করা হলে তা নেহায়েতই বেখাপ্পা ঠেকতো যা কোরআন মজীদ সম্পর্কে চিন্তা করা যায় না।

এখানে ধারণা হতে পারে যে, আহলে কিতাব্ হয়তো কোরআন মজীদের এক আয়াত্ দ্বারা অন্য আয়াত্ রহিতকরণকেই যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলো এবং কোরআন মজীদ তাদের সে যুক্তি খণ্ডন করেছে।

এ ধারণা এ কারণে ঠিক নয় যে, কোরআন মজীদ যেখানে পূর্ববর্তী সকল কিতাবকেই মানসূখ্ করে দিয়েছে সেখানে তারা সে

বিষয় নিয়ে বিতর্ক না করে কোরআনের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে বিতর্ক করবে; এটা অস্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ সত্যি সত্যিই যদি কোরআনের কোনো আয়াত্ মানসূখ্ হতো তাহলে তা আহলে কিতাবের বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টার জন্য সহায়ক হতো। কারণ, মানবিক বিচারবুদ্ধি শত শত বছর পূর্বে মানবসভ্যতার প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ে নাযিল্ হওয়া এবং পরে মূল ভাষা থেকে হারিয়ে যাওয়া বিকৃত গ্রন্থ রহিতকরণের যৌক্তিকতা যতো সহজে মেনে নিতে পারে, স্বল্প সময় পূর্বে নাযিল্কৃত অবিকৃত আয়াত্ বা তার হুকুম রহিত হওয়ার যৌক্তিকতা ততো সহজে মেনে নিতে পারে না। এরূপ হলে আহলে কিতাবের লোকেরা বলতে পারতো যে, এতো অল্প সময়ের ব্যবধানে যে কিতাবের হুকুমের দুর্বলতা বা ভুল ধরা পড়লো এবং তা রহিত করে নতুন হুকুম জারী করতে হলো, তা কি করে আল্লাহর কালাম হয়? এ ক্ষেত্রে 'অধিকতর উত্তম বা অনুরূপ আয়াত্' নাযিলের যুক্তি যথেষ্ট হতো না। কারণ, সে ক্ষেত্রে বলা যেতো : মাত্র কয়েক মাস বা কয়েক বছরের ব্যবধানে পরিবর্তন না করে প্রথমেই চূড়ান্ত হুকুম নাযিল্ করলে ক্ষতি কী ছিলো?

নিঃসন্দেহে কোরআন মজীদের আয়াত্ বা তার হুকুম মানসূখ্ হলে আহলে কিতাবের পক্ষ থেকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি সহজ হতো। যারা কোরআন মজীদের এক আয়াত্ দ্বারা আরেক আয়াতের হুকুম মানসূখ্ হতে পারে বলে মনে করেন (বস্তুতঃ দু'একটি বাদে সবগুলো দৃষ্টান্তই এ পর্যায়ের) তাঁরা দু'টি আয়াতের হুকুমকে পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে করেই এ ধারণায় উপনীত হয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁরা সংশ্লিষ্ট দুই আয়াতের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণেই এ ধরনের ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। নচেৎ কোরআন মজীদে কোনো স্ববিরোধিতা নেই, না তথ্যমূলক আয়াতে, না নির্দেশমূলক আয়াতে।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

"তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? তা (কোরআন) যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে এসে থাকতো (বা অন্য কারো রচিত হতো) তাহলে তাতে অনেক অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হতো।" (সূরাহ্ আন্-নিসা' : ৮২)

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, কোরআন মজীদ নাযিলের যুগে কোরআন-বিরোধীরা কোরআনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করলেও স্ববিরোধিতা বা অসামঞ্জস্যের দাবী উপস্থাপন করে নি। ওলামায়ে ইসলামের একাংশ কোরআন মজীদের যে সব আয়াতের হুকুমকে পরস্পরবিরোধী বা অসামঞ্জস্যশীল মনে করে নাসেখ্-মানসূখের কথা বলেছেন সে সব আয়াতকে যদি নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর জীবদ্দশায় পরস্পরবিরোধী বা অসামঞ্জস্যশীল মনে করা হতো তাহলে এ নিয়ে ইসলামের দুশমনরা দারুণ হৈচৈ সৃষ্টি করতো এবং তা ইতিহাসে, সীরাতে ও হাদীছে লিপিবদ্ধ থাকতো। এমনকি সে ক্ষেত্রে নাসেখ্-মানসূখের ব্যাখ্যা ইসলাম-বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে পারতো না।

তাছাড়া নাসেখ্-মানসূখের উল্লেখ সম্বলিত আয়াতে (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ১০৬) 'আয়াত্' মানসূখ্ করার কথা বলা হয়েছে, আয়াত্ বহাল রেখে তার হুকুম মানসূখ্ করার কথা বলা হয় নি। এমতাবস্থায় কোরআন মজীদের যে সব আয়াতের হুকুমকে পরস্পরবিরোধী মনে করা হচ্ছে এ আয়াতের দ্বারা তার ব্যাখ্যা করা বা দু'টি কথিত পরস্পরবিরোধী আয়াতের একটির হুকুমকে মানসূখ্ গণ্য করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় কথিত পরস্পরবিরোধী আয়াতের উভয়টিরই পাঠ বহাল রাখা আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত (পরম প্রজ্ঞা) ও ঘোষণার (সূরাহ্ আন্-নিসা' : ৮২) পরিপন্থী হতো। অতএব, নিঃসন্দেহে এসব আয়াতে পরস্পরবিরোধিতা নেই এবং নাসেখ্-মানসূখের কোনো ব্যাপার নেই।

কোরআন মজীদে নাসেখ্-মানসূখের প্রবক্তাগণের দাবী হচ্ছে এই যে, মানসূখ্ হুকুমগুলো সাময়িক প্রয়োজনে নাযিল্ হয়েছিলো, তাই পরে স্থায়ী হুকুম নাযিল্ করে তা মানসূখ্ করা হয়। এই সাময়িক প্রয়োজনের যুক্তি সঠিক হলে সে ক্ষেত্রে খোদায়ী হিকমতের দাবী অনুযায়ী ঐসব হুকুম কোরআন মজীদের আয়াতরূপে নাযিল্ না হয়ে ওয়াহীয়ে গ্বায়রে মাতলূ রূপে নযিল হয়ে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর মাধ্যমে জারী হতে পারতো এবং সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হুকুমের গুরুত্ব মোটেই হ্রাস পেতো না। কারণ, নামায আদায়ের নিয়মাবলী সহ এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত রয়েছে। এমনকি ক্বিবলাহর মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও প্রথমে ওয়াহীয়ে গ্বায়রে মাতলূ-র মাধ্যমে বায়তুল্ মাক্বদেসকে সাময়িকভাবে ক্বিবলাহ্ নির্ধারণ করা হয় এবং পরে কোরআন মজীদের আয়াত নাযিলের মাধ্যমে কা'বাহকে স্থায়ীভাবে ক্বিবলাহ্ নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং যা কিছু থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরাহ্ আল্-হাশর্ : ৭)

এ আয়াত্ শুধু পার্থিব সম্পদ প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য নয়, নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর যে কোনো আদেশ-নিষেধই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা যে নবী করীম (ছ্বাঃ)-কে বহু শর'ঈ বিধান প্রণয়নের এখতিয়ার দেন অর্থাৎ ওয়াহীয়ে গ্বায়রে মাতলূ-র সাহায্যে তাঁর মাধ্যমে বহু বিধান পেশ করেন, অন্য আয়াতে তার প্রমাণ আছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"আর তিনি (রাসূল) তাদের জন্য পবিত্র জিনিসগুলোকে হালাল করে দেন এবং নোংরা-অপবিত্র জিনিসগুলোকে তাদের জন্য হারাম করে দেন।" (সূরাহ্ আল্-আ'রাফ : ১৫৭)

অতএব, কথিত সাময়িক বিধানগুলো কোরআনের আয়াত্ ছাড়াই হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর মাধ্যমে জারী হতে কোনো বাধা ছিলো না। বরং এটাই উত্তম হতো। অথবা সংশ্লিষ্ট আয়াতের হুকুমটাই এমনভাবে বর্ণিত হতো যাতে প্রমাণিত হতো যে, তা সাময়িক। অথবা হুকুম বাতিলের সাথে সাথে আয়াতটিও তুলে নেয়াই হতো অধিকতর উত্তম। সবচেয়ে ভালো হতো আয়াতটি সংশ্লিষ্ট সকলের স্মৃতি থেকে মুছে দেয়া।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে হুকুম সাময়িক তার ক্ষেত্রে নাসখ্ কথাটি আদৌ প্রযোজ্য নয়। কারণ সংশ্লিষ্ট হুকুমের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে নিজ থেকেই তার কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তার হুকুম রহিত করার প্রশ্নই ওঠে না। তবে সংশ্লিষ্ট হুকুম যে সাময়িক সে ব্যাপারে অবশ্যই সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকতে হবে।

বস্তুতঃ নাসখ্ কেবল এমন হুকুমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে যাতে স্থায়ী হুকুমের বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান এবং সাময়িক হবার কোনো নিদর্শন দৃশ্যমান নয়। যেমন : পূর্ববর্তী শরী'আত্ সমূহে বর্ণিত 'ইবাদতের প্রক্রিয়া, ক্বিবলাহ ও আরো কতক বিষয় সংক্রান্ত বিধান। কোরআন মজীদের কোনো বিধানের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ, কোরআন মজীদ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের সর্বশেষ ও পূর্ণতম সংস্করণ – যাতে সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ শরী'আহ অন্তর্ভুক্ত। অতএব, তাতে কোনো বিধান দৃশ্যতঃ স্থায়ী বিধানরূপে নাযিল্ হবার পর তা মানসূখ্ হওয়া খোদায়ী প্রজ্ঞার পরিপন্থী। কারণ, এর ফলে কেউ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর নবী হওয়া ও কোরআন মজীদের আল্লাহর কিতাব্ হবার ব্যাপারে সংশয়ে পতিত হলে তার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার হুজ্জাত্ পূর্ণ হবে না। অতএব, কোরআন মজীদে এ ধরনের মানসূখের কোনো ব্যাপার নেই।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করতে হয় যে, কোরআন মজীদে নাসেখ্-মানসূখের প্রবক্তাগণের ধারণার ভিত্তি হচ্ছে কথিত স্ববিরোধিতা [হযরত

রাসূলুল্লাহ (ছ্বাঃ)-এর জীবদ্দশায় কাফেররা যার কথা বলে নি] ও কতক হাদীছ - যা খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের, মুতাওয়াতির্ পর্যায়ের নয়।

স্ববিরোধিতার ধারণার ভ্রান্তি আমরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছি। হাদীছ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, যেহেতু কোরআন মজীদ হচ্ছে মানব জাতির ইতিহাসে সর্বোচ্চ পর্যায়ের মুতাওয়াতির্ গ্রন্থ, সেহেতু খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ দ্বারা তো নয়ই, বরং সাধারণ মুতাওয়াতির্ পর্যায়ের হাদীছ দ্বারাও তার হুকুম মানসূখ্ হতে পারে না। কেবল কোরআন মজীদের কোনো আয়াতে অন্য আয়াতের হুকুম মানসূখ্ হবার কথা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন শব্দে ও ভাষায় উল্লেখ থাকলেই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারতো। কিন্তু কোরআন মজীদে এমন কথা কোনো আয়াতে উল্লেখ করা হয় নি।

এবার আমরা হুকুম বহাল রেখে আয়াতের তেলাওয়াত্ মানসূখ্ করার ধারণার প্রতি দৃষ্টি দেবো।

কোরআন মজীদের কোনো আয়াতের তেলাওয়াত্ মানসূখ্ হওয়া অর্থাৎ তা কোরআনের আয়াত্ হিসেবে গণ্য হবে অথচ গ্রন্থে (মুছ্বহাফ্-এ) থাকবে না এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ, সে ক্ষেত্রে মানতে হবে যে, আমাদের নিকট যে কোরআন রয়েছে তা অসম্পূর্ণ। কিন্তু সর্বসম্মত মত এবং স্বয়ং কোরআন মজীদেরও ঘোষণা হচ্ছে এই যে, কোরআন মজীদ সম্পূর্ণ গ্রন্থ।

কথিত তেলাওয়াত্-রহিত আয়াত্ সম্পর্কে বলা হতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট আয়াত্ প্রথমে কোরআন মজীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, পরে তা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে কোরআন থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, কোনো কথার কোরআন মজীদের আয়াত্ হওয়ার মানেই হচ্ছে এই যে, কোরআন মজীদ ভাষার আবরণে লোকদের সামনে নাযিল্ হবার পূর্বেই তা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত ছিলো। এমতাবস্থায় তা থেকে কোনো আয়াত্ পরবর্তীকালে বাদ দেয়ার কথা ধারণা করা চলে না। কারণ, কথিত আয়াত্ যদি কোরআনের আয়াতরূপে সংরক্ষিত থেকে থাকবে তো তা কোরআন থেকে বাদ দেয়া

সম্ভব নয়। আর যদি তা বাদ দেয়া সম্ভব হয় তাহলে তা আদৌ সংরক্ষিত ছিলো না। অতএব, তা কোরআনের আয়াত্ ছিলো না।

তাছাড়া আয়াত্ বহাল রেখে হুকুম রহিতকরণ যতোখানি অস্বাভাবিক, হুকুম বহাল রেখে আয়াত্ (তেলাওয়াত) রহিতকরণ তার তুলনায় বহু গুণ বেশী অস্বাভাবিক। এমতাবস্থায় রজম (বিবাহিত ব্যাভিচারীকে প্রস্তারাঘাতের শাস্তিদান) সংক্রান্ত হাদীছসমূহ নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। এতে যদি রজম-এর শাস্তি কার্যকর করার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় (এবং তা হবে) তাহলে বুঝতে হবে, এ শাস্তি ইসলামী হুকুমতের প্রধান হিসেবে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) কর্তৃক রাষ্ট্রীয় দণ্ডবিধি হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিলো। কারণ, ইসলামী হুকুমাতের প্রধান হিসেবে হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর এরূপ বা অন্য কোনো শাস্তি নির্ধারণ ও কার্যকর করার পূর্ণ এখতিয়ার ছিলো।

মোদ্দা কথা, কোরআন মজীদের কোনো আয়াতের – তা তথ্যমূলকই হাক বা আদেশমূলকই হোক – তেলাওয়াত্ রহিত হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

কথিত পরস্পরবিরোধী আহকাম্

আমরা প্রমাণ করেছি যে, কোরআন মজীদের কোনো আয়াতের হুকুম রহিত হওয়া সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোরআন মজীদ যে আল্লাহর কিতাব্ – এ সত্য ইসলামের মৌল নীতিমালা (উছূলে ‘আক্বাএদ্)-এর অন্যতম বিষয়। কোরআন মজীদের আল্লাহর কিতাব্ হওয়া ও নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর আল্লাহর নবী হওয়া পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বিষয়। তাই কোরআন মজীদ আল্লাহর কিতাব্ – এ ব্যাপারে প্রত্যয় সৃষ্টির পরে এর একেকটি আয়াত্ নিয়ে তা আল্লাহর আয়াত্ কিনা সে ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ নেই। একইভাবে কোরআনের একেকটি হুকুমবাচক আয়াত্ নিয়ে সংশ্লিষ্ট হুকুমটি কার্যকর আছে কিনা বা দু'টি আয়াতের হুকুমের মধ্যে পারস্পরিক সাংঘর্ষিকতা

আছে কিনা এ ব্যাপারে চিন্তা করার অবকাশ নেই, যদি না কোনো হুকুমের সাময়িক হবার ব্যাপারে স্বয়ং কোরআন মজীদেরই অন্য কোনো আয়াতে অকাট্য নিদর্শন থাকে। এরূপ চিন্তা ঈমানের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। বরং কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার নাযিল্কৃত সর্বশেষ, পূর্ণাঙ্গ ও সংরক্ষিত কিতাব – এ মর্মে ঈমান পোষণ করার মানেই হচ্ছে এর সকল আয়াতকে সংশ্লিষ্ট বিন্যাসসহ আল্লাহর আয়াতরূপে গণ্য করা এবং এর সকল হুকুমকেই বহাল গণ্য করা।

এমতাবস্থায় কোরআন মজীদ অধ্যয়ন করতে গিয়ে কোথাও দুই আয়াতের হুকুমের মধ্যে দৃশ্যতঃ সাংঘর্ষিকতা আছে বলে দেখা গেলে বুঝতে হবে, আমাদের পক্ষে সংশ্লিষ্ট আয়াতের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব হয় নি। এমতাবস্থায় স্বীয় কোরআন-অনুধাবনক্ষমতাকে শানিত করে সংশ্লিষ্ট আয়াতদ্বয়ের তাৎপর্য নতুন করে অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে।

কোরআন মজীদের তাৎপর্য সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য যে পূর্বপ্রস্তুতির (مقدمات) প্রয়োজন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অত্র প্রবন্ধের আওতাভুক্ত নয়, বরং তা স্বতন্ত্রভাবে বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। এখানে শুধু এতোটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট (ইতিপূর্বেও যে সম্পর্কে আভাস দেয়া হয়েছে) যে, কোরআন মজীদের আয়াতসমূহ যেমন পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটি সামগ্রিক বক্তব্য (গ্রন্থ), তেমনি কোরআনে বর্ণিত হুকুমসমূহ একটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের বিভিন্ন অংশ। কোরআন মজীদের বিভিন্ন হুকুমের মধ্যে যেমন নীতিগত দিকনির্দেশনা আছে, তেমনি আছে মৌলিক বিধান। এছাড়া একদিকে যেমন সাধারণ বিধান আছে, তেমনি আছে বিশেষ বিধান এবং সাধারণ বিধানের অবস্থা থেকে ব্যতিক্রম অবস্থার বিধান। এছাড়া আছে পরীক্ষার জন্য নাযিল্কৃত আদেশ ও সাময়িক কার্যকর আদেশ – যা সুস্পষ্ট নিদর্শন দ্বারা বুঝা যায়। এছাড়া আদেশের পাশাপাশি রয়েছে নছীহত্ যা মেনে চলাই উত্তম, কিন্তু তাকে অবশ্য পালনীয় বিধানরূপে নির্ধারণ করা হয় নি। দৃশ্যতঃ দু'টি আয়াতের হুকুমের মধ্যে সাংঘর্ষিকতা দেখা গেলে তা

নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে দেখা যাবে, দু'টি হুকুমের মধ্যে উপরোক্ত কোনো না কোনোরূপে সমন্বয় রয়েছে।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, কেবল 'সমন্বয় অসম্ভব' এমন দু'টি হুকুমকেই পরস্পরবিরোধী গণ্য করা যায় এবং কেবল এরূপ ক্ষেত্রেই একটি হুকুম মানসূখ্ হবার কথা ধারণা করা যায়। কিন্তু কোরআন মজীদে এমন কোনো পরস্পরবিরোধী হুকুম নেই। অতএব, কোনো হুকুম মানসূখ্ হয় নি।

এ প্রসঙ্গে আরো স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কোনো বিশেষ অবস্থা বা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যে হুকুম দেয়া হয় তার অর্থ হচ্ছে, কেবল ঐ অবস্থা বা পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সে ক্ষেত্রে এটাই হুকুম। এমতাবস্থায়, আর কখনোই যদি ঐ পরিস্থিতি বা অবস্থার উদ্ভব হবার সুযোগ বা সম্ভাবনা না থাকে তথাপি ঐ হুকুমকে মানসূখ্ গণ্য করা যাবে না। কারণ, মূলতঃই হুকুমটি শর্তযুক্ত অর্থাৎ শর্ত বিদ্যমান থাকলে বা দেখা দিলেই ঐ হুকুম কার্যকর হবে; শর্ত বিদ্যমান না থাকলে 'মানসূখ্' কথাটি আদৌ প্রযোজ্য হতে পারে না। বরং এ ধরনের হুকুম শর্ত থাকা সত্ত্বেও 'আর প্রযোজ্য হবে না' মর্মে নতুন আদেশ জারী হলে কেবল তখনই প্রথম হুকুমটি মানসূখ্ বলে গণ্য হবে।

কোরআন মজীদের যে সব আয়াতের হুকুমকে মানসূখ্ গণ্য করা হয় উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন করে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে তার কোনোটিই মানসূখ্ হয় নি। বস্তুতঃ এ কারণেই যারা কোরআনের আয়াতের হুকুম মানসূখযোগ্য বলে মনে করেন তাঁরা কথিত মানসূখ্ হুকুম-সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ যিনি যতোটি হুকুমকে অন্য হুকুমের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করেছেন এবং কোনোভাবেই সমন্বয় খুঁজে বের করতে পারেন নি তিনি এরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রেই কথিত 'সাংঘর্ষিক হুকুমদ্বয় বা হুকুম সমূহের' একটিকে বহাল গণ্য করে অপরটি বা অপরগুলোকে মানসূখ্ গণ্য করেছেন। এভাবেই কথিত মানসূখ্ হুকুম-সংখ্যার ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি

হয়েছে। কোরআন মজীদের কোনো হুকুম যে মানসূখযোগ্য নয় এ মতানৈক্যও তার অন্যতম প্রমাণ।

এবার আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যাপকভাবে 'মানসূখ্ গণ্যকৃত' কয়েকটি হুকুম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে প্রমাণ করবো যে, এ সব হুকুম মানসূখ্ হয় নি।

১) মদ সংক্রান্ত হুকুম

বলা হয় যে, ইসলামী শরী'আতে প্রথমে মদ হারাম ছিলো না, পরে ধাপে ধাপে তা হারাম করা হয় এবং সর্বশেষ হুকুমের দ্বারা পূর্ববর্তী হুকুমকে মানসূখ্ করা হয়। বলা হয়, প্রথমে মদের অপকারিতা তুলে ধরে আয়াত্ নাযিল্ হয়। এ আয়াতটি হচ্ছে :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

"(হে রাসূল!) তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। (তাদেরকে) বলে দিন, এতদুভয়ের মধ্যে বিরাট গুনাহ এবং মানুষের জন্য উপকারিতা রয়েছে। আর এতদুভয়ের গুনাহ্ উভয়ের উপকারিতার চেয়ে বড় (বা বেশী)।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ২১৯)

বলা হয়, এতে মদ হারাম করা হয় নি, তবে মাকরূহ বলে তুলে ধরা হয়। এরপর নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায আদায়ে নিষেধ করা হয়। এতদসংক্রান্ত আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছে যেয়ো না যে, তোমরা জানো না তোমরা কি বলছো।" (সূরাহ্ আন্-নিসা' : ৪৩)

বলা হয়, এ আয়াতের দ্বারা মদপানে অভ্যস্ত মুসলমানদের মদপানের মাত্রাকে সীমিত করে আনা হয়। এরপর মদ হারাম করার আয়াত্ নাযিল্ করা হয়। এ আয়াত্ হচ্ছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে ঈমানদারগণ! নিঃসন্দেহে মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ হচ্ছে শয়তানের অপকৃষ্ট কর্ম, অতএব, এগুলো বর্জন করো, তাহলে আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করবে।" (সূরাহ্ আল্-মাএদাহ্ : ৯০)

এ ব্যাপারে কোনো কোনো মতে, উল্লিখিত দ্বিতীয় আয়াতটি প্রথমে ও প্রথম আয়াতটি দ্বিতীয় বারে নাযিল্ হয়েছে। তবে উভয় অবস্থায়ই ধরে নেয়া হয়েছে যে, মদ প্রথমে মোবাহ ছিলো, তারপর তা মাকরূহ ও পরে হারাম করা হয়। ফলে মাকরূহর হুকুম দ্বারা মোবাহর হুকুম ও হারামের হুকুম দ্বারা মাকরূহর হুকুম মানসূখ্ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে হাদীছও বর্ণনা করা হয় যাতে বলা হয়েছে যে, ছ্বাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকে মদ খেতেন এবং প্রথম বা দ্বিতীয় আয়াত্ নাযিল্ হবার পর তাঁদের বেশীরভাগই মদ্যপান ছেড়ে দেন। অতঃপর স্বল্পসংখ্যক ছ্বাহাবী সীমিত পরিমাণে ও এমন সময়ে মদ খেতেন যাতে নামাযের সময় হবার আগেই নেশা কেটে যায়। অতঃপর মদ হারামের আয়াত্ নাযিল্ হয় এবং যারা মদ পানরত অবস্থায় এ আয়াতের কথা জানতে পারেন তাঁরা তখনই মদ ছেড়ে দেন ও মদের পাত্র ভেঙ্গে ফেলেন, এমনকি কেউ কেউ গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে পেটের মধ্যকার মদও ফেলে দেন।

কিন্তু এ দৃষ্টান্ত নাসেখ্-মানসূখের খুবই দুর্বল দৃষ্টান্ত। কারণ, উক্ত আয়াত্ সমূহের কোনোটিতে বা অন্য কোনো আয়াতেই মদ খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয় নি। অতএব, কোনো আয়াতের হুকুম মানসূখ্ হবার প্রশ্ন ওঠে না। যে আয়াতে মদের গুনাহ ও উপকারিতার কথা বলা হয়েছে তা একটি তথ্যমূলক আয়াত্, হুকুমমূলক নয়, অতএব, তার হুকুম মানসূখ্ হবার প্রশ্ন ওঠে না।

আর সূরাহ্ নিসা'র ৪৩ নং আয়াতকে নেশাগ্রস্ততা সম্পর্কিত বলে ধরে নেয়া হলেও প্রকৃত পক্ষে তা নয়। কারণ, سُكَارَى বলতে এমন এক

অবস্থা বুঝায় যখন মানুষ পুরোপুরি সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে না এবং তার বিচারবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি সঠিকভাবে কাজ করে না। এ অবস্থা কেবল নেশাখোরীর কারণে হয় না; নেশাখোরীর কারণেও হতে পারে, অন্য কারণেও হতে পারে। যেমন : কোনো রোগ বা ভাইরাসের আক্রমণের কারণে, নিদ্রাহীনতা বা অতি পরিশ্রমজনিত ঘুম-ঘুম ভাবের কারণেও হতে পারে। অবশ্য এর মাত্রায় কম-বেশী হতে পারে। তবে এ ধরনের অবস্থা যদি এমন পর্যায়ের হয় যে, ব্যক্তি কী বলছে তা নিজেই জানে না, সে অবস্থায় নামায আদায়ের চেষ্টা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি এ অবস্থায় নামায আদায় করলেও তা নামাযরূপে গণ্য হবে না। কারণ, 'ইবাদতের কাজসমূহ সচেতন-সজ্ঞানভাবে সম্পাদন করতে হয়।

অভিন্ন শব্দমূল (سكر) থেকে নিষ্পন্ন শব্দাবলী কোরআন মজীদে নেশাগ্রস্ততা ছাড়াও অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে :

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ.

"আর আমি যদি তাদের সামনে আসমানের কোনো দরযাহ্ও উন্মুক্ত করে দেই – যা দিয়ে তারা ওপরে আরোহণ করবে তাহলেও তারা অবশ্যই বলবে : নিঃসন্দেহে আমাদের দৃষ্টিসমূহ আচ্ছন্ন হয়েছে, বরং আমরা এক জাদুগ্রস্ত জনগোষ্ঠী।" (সূরাহ্ আল্-হিজর : ১৫)

এছাড়া মৃত্যুকালীন আচ্ছন্নতা অর্থেও অভিন্ন শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ

"আর সত্যি সত্যিই মৃত্যুর আচ্ছন্নতা এসে গিয়েছে।" (সূরাহ্ ক্বাফ্ : ১৯)

যারা সংজ্ঞা থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাদের মৃত্যুপূর্ব আচ্ছন্নতার অবস্থা অনেকেই প্রত্যক্ষ করে থাকবেন। আসন্ন মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর মানুষের সামনে যখন আলমে বারযাখের দরযাহ্ উন্মুক্ত হয়ে যায় অথচ পার্থিব জগতের সাথেও তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি

তখন এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয়। নিঃসন্দেহে মানুষের মৃত্যুপূর্ব এ আচ্ছন্নতাকে কেউ নেশাগ্রস্ততা নামে অভিহিত করবে না।

যা-ই হোক, সূরাহ্ আন্-নিসা'র ৪৩ নং আয়াতে উল্লিখিত سُكَارَى শব্দ থেকে নেশাগ্রস্ততার অর্থ গ্রহণ এবং তার ভিত্তিতে 'প্রথমে মদ মোবাহ ছিলো, কেবল নামাযের সময় নেশাগ্রস্ত থাকতে নিষেধ করা হয়েছিলো" – এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু এ বিশ্লেষণ ছাড়াই তত্ত্বগতভাবেই বলা যায় যে, ইসলামে কখনোই মদ বৈধ ছিলো না; থাকতে পারে না। কারণ মদ হারাম হওয়ার বিধানটি ঐ ধরনের শর'ঈ বিধানের অন্তর্গত যা সংশ্লিষ্ট বস্তুর ও মানুষের সৃষ্টিপ্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে অপরিহার্য ও অপরিবর্তনীয়। তাই মদ উৎপাদিত হওয়ার দিন থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর শরী'আতে মদ হারাম হতে বাধ্য। কারণ, যে খাদ্য বা পানীয় মানুষের জন্য শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, চারিত্রিক বা আত্মিক ক্ষতির কারণ আল্লাহর শরী'আতে তা কখনোই অনুমোদিত থাকতে পারে না (জীবন বাঁচানোর ন্যায় ব্যতিক্রমী প্রয়োজন ব্যতীত)।

তাছাড়া তাওরাতে সুস্পষ্ট ভাষায় মদ হারাম করা হয়েছে। অতএব, পূর্ববর্তী নবীদের শরী'আতে যেখানে মদ হারাম ছিলো সেখানে হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর শরী'আতে প্রথমে মদ বৈধ ছিলো, পরে হারাম করা হয় – এটা হতেই পারে না। কারণ, তাহলে ইয়াহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিতরা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী যুক্তি দাঁড় করাতে পারতো। তারা বলতে পারতো, 'যে ব্যক্তি মদের মত ঘৃণ্য নাপাক বস্তুকে বৈধ গণ্য করে এবং তার অনুসারীরা তা পান করে, সে ব্যক্তি কী করে নবী হতে পারে?' আর লোকদের কাছে, এমনকি স্বয়ং মদ্যপায়ীদের কাছেও এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতো। কিন্তু এ ধরনের কোনো যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছিলো বলে কোনো সূত্র থেকেই জানা যায় না।

বস্তুতঃ এটা মনে করা একটা ভ্রান্ত ধারণা যে, যখন কোনো বস্তু বা কাজ হারাম বলে ঘোষণা করে অথবা তা খেতে বা করতে

নিষেধ করে আয়াত্ নাযিল্ হয় কেবল তখন থেকেই তা হারাম হয় এবং তার পূর্বে তা বৈধ ছিলো। এ ধারণা ঠিক হলে বলতে হবে, ব্যাভিচার, সমকামিতা, নরহত্যা, ওযনে কম দেয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে আয়াত্ নাযিল্ হবার পূর্বে ঐ সব কাজ জায়েয ছিলো; নিঃসন্দেহে তা জায়েয ছিলো না।

বরং প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, যে সব বস্তু বা কাজ হারাম হওয়া অপরিহার্য ও অপরিবর্তনীয় - যার হারাম হওয়ার বিষয়টি আপেক্ষিক নয়, তা সব নবী-রাসূলের (‘আঃ) শরী‘আতে সব সময়ই হারাম ছিলো। তাই নিঃসন্দেহে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর শরী‘আতেও তা শুরু থেকেই হারাম ছিলো এবং নিঃসন্দেহে তাঁর অনুসারীগণ এ থেকে বিরত থাকতেন বা তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে এ সব থেকে বিরত রাখতেন। কারণ এ ছিলো তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর এ দায়িত্ব সম্বন্ধেই এরশাদ করেছেন :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“আর তিনি (রাসূল) তাদের জন্য পবিত্র জিনিসগুলোকে হালাল করে দেন এবং নোংরা-অপবিত্র জিনিসগুলোকে তাদের জন্য হারাম করে দেন।” (সূরাহ্ আল্-আ'রাফ্ : ১৫৭)

অবশ্য আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর অন্তরে ‘ইলমে হুযূরী আকারে কোরআন মজীদের যে পরিপূর্ণ ভাব ও তাৎপর্য নাযিল্ করেন তার আলোকেই তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। পরে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ ভাষার আবরণে নাযিল্ হয়।

যা-ই হোক, আলোচ্য তিনটি আয়াতের একটিতে মদের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে ও তা পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে, একটিতে মদপায়ীদের যুক্তিকে খণ্ডন করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তার ক্ষতি উপকারের চেয়ে বেশী (অতএব, তা পানের অনুমতি দেয়া চলে না) এবং অপর আয়াতটিতে একটি বিশেষ অবস্থায়

নামায না পড়ার কথা বলা হয়েছে - নেশাগ্রস্ততা যে অবস্থা সৃষ্টি হবার অন্যতম কারণ, একমাত্র কারণ নয়। আর যেহেতু মদপান সব সময়ই হারাম ছিলো সেহেতু এ আয়াতের লক্ষ্য অন্যান্য কারণ থেকে উদ্ভূত উক্ত অবস্থা।

অতএব, এখানে নাসেখ্-মানসূখের কোনো ব্যাপার নেই।

২) মীরাছ্ সংক্রান্ত বিধান ও ওয়াছ্বীয়াত্

আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদে এরশাদ করেছেন :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

"তোমাদের ওপর বিধিবদ্ধ করে দেয়া হল যে, তোমাদের মধ্যে যখন কারো সামনে মৃত্যু উপস্থিত হবে তখন তার যদি ধনসম্পদ থাকে তাহলে সে যেন তার পিতা-মাতা ও আপনজনদের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে ওয়াছ্বীয়াত্ করে; এ হচ্ছে মুত্তাক্বীদের ওপর আরোপিত হক্ব।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ১৮০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ করেছেন :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ

"আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদের রেখে মৃত্যুবরণ করে তারা যেন তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে ওয়াছ্বীয়াত্ করে যায় যাতে তাদেরকে (বাড়ীঘর থেকে) বহিষ্কার না করে এক বছর পর্যন্ত ভরণ-পোষণ দেয়া হয়। অতঃপর তারা যদি (বাড়ীঘর ছেড়ে) চলে যায় তো সে ক্ষেত্রে তারা প্রচলিত নিয়মে (বা উত্তম বিবেচনায়) নিজেদের ব্যাপারে যা করেছে তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ২৪০)

[আয়াতের ভাষা থেকে যা বুঝা যায় তাতে বহিষ্কার না করার নির্দেশটি এক বছরের জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে, আবার অনির্দিষ্ট কালের জন্যও হতে পারে (যদি না সে নিজেই চলে যায়)। এখানে

ভরণপোষণের মেয়াদ হিসেবে এক বছরের কথা উল্লেখ করার পরে বহিষ্কার না করার কথা উল্লেখ করা থেকে মনে হয় যে, এর সাথে এক বছরের শর্ত যুক্ত নয়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, পরিবারপ্রধান পরিবারের সদস্যদেরকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যে সব দ্রব্যাদি ও সম্পদ প্রদান করে, যেমন : অলঙ্কারাদি, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র ইত্যাদি, সে সব মীরাছ হিসেবে বণ্টনযোগ্য নয়, বরং তা ব্যবহারকারীর সম্পদ হিসেবে পরিগণিত। তেমনি স্বত্ব ত্যাগ না করে শুধু ব্যবহারের জন্য কোনো সম্পদ দেয়া হলে ব্যক্তি যতোদিন তা ব্যবহার করবে ততোদিন তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয়া যাবে না। ব্যক্তিগতভাবে বসবাস ও ব্যবহারে ঘর বা কক্ষ (যা ভাড়া দিয়ে অর্থোপার্জন করা হয় না) হয় ব্যক্তিগত সম্পদ বলে গণ্য হবে, নয়তো ব্যবহারের অধিকারপ্রাপ্ত সম্পদ বলে গণ্য হবে। এতদুভয়ের কোনো অবস্থায়ই ব্যক্তিকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে ঐ গৃহ বা কক্ষকে মীরাছভুক্ত গণ্য করা যাবে না, বরং সে ঐ গৃহ বা কক্ষ পরিত্যাগ করলে কেবল তখনই তা মৃত ব্যক্তির মীরাছরূপে গণ্য হবে। হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর বিবিগণের ব্যবহৃত ঘরসমূহকে তাঁর মীরাছে পরিণত করার কথা জানা যায় না।]

বলা হয় যে, মীরাছ সংক্রান্ত বিধান নাযিল্ হওয়ার পরে এ উভয় আয়াতের হুকুম মানসূখ্ হয়ে গেছে।

কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, মীরাছ্ সংক্রান্ত আয়াতেও ওয়াছ্বীয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরাহ্ নিসা'র ১১ ও ১২ নং আয়াতে কয়েক বার বলা হয়েছে যে, কৃত ওয়াছ্বীয়াত্ বা ঋণ থাকলে তা আদায়ের পরে (بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) নির্ধারিত হারে মীরাছ বণ্টন করতে হবে। এখানে ওয়াছ্বীয়াত্ ও ঋণের কথা যেভাবে বলা হয়েছে তা থেকে সুস্পষ্ট যে, তা কেবল মীরাছ বণ্টনের পূর্বশর্তই নয়, বরং وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا থেকে বুঝা যায় যে, ওয়াছ্বীয়াত্ অবশ্যই থাকবে, কিন্তু أَوْ دَيْنٍ থেকে বুঝা যায় যে, ঋণ না-ও থাকতে পারে।

কোরআন মজীদের অভ্যন্তরে নাসেখ্-মানসূখের প্রবক্তাদের মতে মীরাছের আয়াতে যে ওয়াছ্বীয়াতের কথা বলা হয়েছে তদনুযায়ী মুমুর্ষু ব্যক্তি ওয়াছ্বীয়াত্ করে গেলে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের জন্য তা তার রেখে যাওয়া মোট সম্পদের সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত আদায় করা ফরয, কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য এরূপ ওয়াছ্বীয়াত্ করা ফরয নয়। কারণ, তাঁদের মতে, মীরাছের আয়াত্ নাযিল্ হবার মাধ্যমে ওয়াছ্বীয়াত্ ফরয হবার হুকুম মানসূখ্ হয়ে গিয়েছে; অতঃপর ওয়াছ্বীয়াত্ করা মুস্তাহাব্।

তাঁদের এ দাবীর পক্ষে কোনো অকাট্য দলীল নেই। অন্যদিকে ওয়াছ্বীয়াতের হুকুমের সাথে মীরাছের হুকুমের কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই। কারণ, ওয়াছ্বীয়াতের হুকুমে সমস্ত সম্পদের ব্যাপারে ওয়াছ্বীয়াত্ করা বাধতামূলক করা হয় নি, অন্যদিকে মীরাছের হুকুমে ওয়াছ্বীয়াত্ পূরণ ও ঋণ শোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা-ই বণ্টন করতে বলা হয়েছে।

নাসেখ্-মানসূখের প্রবক্তাগণ আরো মনে করেন যে, ওয়াছ্বীয়াত্ – তাঁদের মতে যা করা মুস্তাহাব – ওয়ারিশদের জন্য করা যাবে না। কারণ, তারা তো মীরাছই পাচ্ছে। এ-ও তাঁদের যুক্তি যে, যেহেতু উভয় হুকুমই ঘনিষ্ঠ জনদের জন্য সেহেতু ওয়াছ্বীয়াতের হুকুমকে মানসূখ্ গণ্য করতে হবে। তাঁদের এ দাবীর পক্ষেও কোনো অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলীল নেই। মানুষের সীমিত জ্ঞানের যুক্তি দ্বারা আল্লাহর নির্ধারিত ফরয (পিতা-মাতা ও আপনজনদের জন্য ওয়াছ্বীয়াত্) মানসূখ্ গণ্য করা যেতে পারে না। তাছাড়া এ যুক্তি যে খুবই দুর্বল তা সামান্য চিন্তা করলেই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। কারণ মৃত ব্যক্তির ‘উপার্জনে অক্ষম’ বৃদ্ধ পিতা-মাতা তার সম্পদে যে নির্ধারিত অংশ পাবেন তা তাঁদের জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট না-ও হতে পারে। তেমনি তার একটি ছেলে দুর্বল, অক্ষম বা বিকলাঙ্গ হতে পারে, তার একটি কন্যা অবিবাহিতা থাকতে পারে অথবা এক বা একাধিক সন্তানের পড়াশুনার ব্যয়ভার বহনের প্রয়োজন থাকতে পারে। এমতাবস্থায় তাদেরকে শুধু মীরাছের

অংশের ওপর নির্ভরশীল রেখে যাওয়া মানুষের স্বাভাবিক বিবেকবোধের পরিপন্থী এবং যা বিবেকসম্মত ইসলাম তাতে বাধা দেয় না।

অন্যদিকে মুমূর্ষু ব্যক্তির কোনো পুত্র বা কন্যা তার পূর্বেই মারা গিয়ে থাকলে এবং তার বা তাদের সন্তান থাকলে তারা ঐ মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার মীরাছ পাবে না। এমতাবস্থায় তার উচিত তাদের জন্য ওয়াছ্বীয়াত করা; তা না করা বিবেকবিরোধী হবে। কিন্তু ওয়াছ্বীয়াত্ করা যদি ফরয না হয়, মুস্তাহাব হয়, সে ক্ষেত্রে মুমূর্ষু ব্যক্তি ওয়াছ্বীয়াত্ করার ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে পড়তে পারে। ফলে তার ঐ সব নাতি-নাত্নী একেবারেই বঞ্চিত হবে এবং দুর্বল-অক্ষম পিতা-মাতা বা এ ধরনের কোনো সন্তান থাকলে তারা তার আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হবে।

এমতাবস্থায় মুমূর্ষু ব্যক্তি ওয়াছ্বীয়াত্ করাকে ফরয জানলে মৃত্যুশয্যার কষ্ট উপেক্ষা করে ওয়াছ্বীয়াত্ করবে, অন্যথায়, এ ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে পড়বে। আমরা বাস্তবেও দেখতে পাই, যারা ওয়াছ্বীয়াত্ করাকে মুস্তাহাব গণ্য করে তাদের মধ্যে হাজারে একজনও পাওয়া যায় না যে মৃত্যুশয্যায় ওয়াছ্বীয়াত্ করে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমোক্ত আয়াতে ওয়াছ্বীয়াতের সাধারণ হুকুমের পর দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে স্ত্রীদের ব্যাপারে এক বছরের ভরণপোষণ প্রদান ও বাড়ীঘর থেকে বহিস্কার না করার জন্য ওয়াছ্বীয়াত্ করতে বলা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির কোনো স্ত্রীর স্বীয় পরলোকগত স্বামীর প্রতি মহব্বত এতো বেশী হতে পারে যে, 'ইদ্দৎকাল পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নতুন স্বামী গ্রহণের জন্যে তার মন প্রস্তুত না-ও হতে পারে। এমতাবস্থায় সে স্বামীর সাথে যে গৃহে বসবাস করতো তাতে থাকতে চাইলে অবশ্যই তাকে থাকতে দেয়া উচিত। অন্যদিকে মৃত স্বামীর ধনসম্পদে সে যে উত্তরাধিকার পাবে তা থেকে লব্ধ আয় তার ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট না-ও হতে পারে। এমতাবস্থায় মৃত স্বামীর গৃহে বসবাস করলে সে সর্বোচ্চ এক বছরের ভরণপোষণের নিশ্চয়তা পাচ্ছে। অতঃপর তার ভরণপোষণের দায়িত্ব তার নিজের বা নতুন

স্বামী গ্রহণ করে থাকলে তার। আল্লাহ্ তা‘আলার বিধানে যে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে এ আয়াতের হুকুম তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

কোরআন মজীদে যেখানে ওয়াছ্বীয়াতের জন্য সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং মীরাছ বণ্টনকে ওয়াছ্বীয়াত্ আদায়ের শর্তাধীন করা হয়েছে, আর তার কল্যাণকারিতা যেখানে এতো বেশী সেখানে অকাট্য দলীল ছাড়া এ হুকুমকে মানসূখ্ গণ্য করার কোনোই বৈধতা নেই।

৩) ব্যভিচার ও অশ্লীলতার শাস্তি

কোরআন মজীদের এরশাদ হয়েছে :

وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا.

“তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হয় তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন ব্যক্তির সাক্ষ্য নাও এবং যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তাহলে ঐ নারীদেরকে বাড়ীতে আবদ্ধ করে রাখো যে পর্যন্ত না তারা মারা যায় অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য কোনো পথ বের করে দেন। আর তোমাদের মধ্যে যে দু’জন (পুরুষ) তা (অশ্লীল কাজ) করবে তাদেরকে নির্যাতন করো। অতঃপর তারা যদি তাওবাহ করে ও সংশোধিত হয় তাহলে তাদের থেকে বিরত থাকো (আর নির্যাতন করো না)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাওবাহ কবূলকারী ও দয়াবান।” (সূরাহ্ আন্-নিসা’ : ১৫-১৬)

[অনেকে অজ্ঞতাবশতঃ মনে করে যে, এখানে একই অপরাধে পুরুষের তুলনায় নারীকে কঠোরতর শাস্তি দানের বিধান দেয়া হয়েছে অর্থাৎ পুরুষকে যেখানে প্রহার করতে বলা হয়েছে সেখানে নারীকে মৃত্যুর শাস্তি দেয়া হয়েছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, এখানে পুরুষের তুলনায় নারীকে লঘু শাস্তি দেয়া হয়েছে। কারণ কিছু লোকের ভুল

ধারণার বিপরীতে, এখানে কুকর্মকারী নারীকে ঘরে আবদ্ধ রেখে না খাইয়ে মেরে ফেলার কথা বলা হয় নি, বরং তাকে স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত ঘরে আটকে রাখার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মুসলিম নারীরা সমাজে স্বাধীনভাবে বিচরণের যে অধিকার ভোগ করেন কুকর্মকারী নারীকে তা থেকে বঞ্চিত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমরা সামান্য চিন্তা করলেই এ নির্দেশের কল্যাণ বুঝতে পারি। কারণ, তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে সে অন্য নারীদেরকে কলুষিত করার ও একই পথে টেনে নেয়ার অপচেষ্টা চালাবে। অবশ্য আয়াতে আমৃত্যু গৃহবন্দিত্বকে তাদের জন্য অনিবার্য ভাগ্যলিপিও করে দেয়া হয় নি। "অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য কোনো পথ বের করে দেন" বলে সেদিকেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আয়াতে যদিও সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নি তথাপি নারীতে নারীতে কুকর্ম সাধারণতঃ এমন নারীই করতে পারে যে, স্বামীর সুরক্ষার অধিকারী নয় (অবিবাহিতা অথবা বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা – যে 'ইদ্দতের পরে নতুন স্বামী গ্রহণ করে নি)। অন্যদিকে যে নারী এ ধরনের কুকর্মে অভ্যস্ত তা জানার পরে সাধারণতঃ কোনো পুরুষ তাকে বিবাহ করতে আগ্রহী হয় না। এতদসত্ত্বেও যদি কোনো পুরুষ তাকে বিবাহ করতে আগ্রহী হয় এবং সে-ও স্বামী গ্রহণ করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে প্রস্তুত হয় তাহলে তার গৃহবন্দিত্বের অবসান ঘটবে।]

নাসেখ্-মানসূখের প্রবক্তাদের মতে, উল্লিখিত আয়াত্ দু'টি ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত এবং এতে فاحشة (অশ্লীল কাজ) বলতে زنا (ব্যাভিচার) বুঝানো হয়েছে। তাঁদের মতে, প্রথম আয়াতে ব্যাভিচারে লিপ্ত নারীদের জন্য ঘরে আটকে রাখার বিধান দেয়া হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতে সে হুকুম মানসূখ্ করে ব্যাভিচারে লিপ্ত নারী-পুরুষ উভয়কে নির্যাতন করার হুকুম দেয়া হয়েছে, পরে বেত্রাঘাত ও প্রস্তরাঘাতের শাস্তি নাযিল্ হলে উপরোক্ত দ্বিতীয় আয়াতের হুকুমও মানসূখ্ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এখানে নাসেখ্-মানসূখের কোনো ব্যাপারই নেই। কারণ فاحشة বা অশ্লীল কাজ বলতে কেবল একজন

নারী ও একজন পুরুষের মধ্যকার ব্যভিচার বুঝায় না, বরং তাতে ব্যভিচার ছাড়া অন্যান্য অশ্লীল কাজও অন্তর্ভুক্ত - যা দু'জন নারী বা দু'জন পুরুষের মধ্যেও সংঘটিত হতে পারে। উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে এ ধরনের অশ্লীল কাজের কথা বলা হয়েছে, ব্যভিচারের কথা বলা হয় নি।

ওপরে প্রথমোক্ত আয়াতে যে কেবল নারীদের কথা বলা হয়েছে সে ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ নেই। কারণ, তাতে স্ত্রীবাচক সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার ছাড়াও সুস্পষ্ট ভাষায় من نسائكم (তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে) উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় আয়াতে দু'জন পুরুষের কথা বলা হয়েছে; الذان সর্বনাম থেকে এটাই প্রমাণিত। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়কে বুঝাতে চাইলে বহুবচন ব্যবহৃত হতো। কারণ, বহুবচনে পুরুষবাচক الذين সর্বনামে নারীকেও অন্তর্ভুক্ত বুঝানো যায়, কিন্তু দ্বিবচনে পুরুষবাচক الذان সর্বনামে শুধু দু'জন পুরুষকে বুঝানো হয়।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, এ আয়াত্ দু'টিতে ব্যভিচারের শাস্তির বিধান দেয়া হয় নি, তাই ব্যভিচারের শাস্তির বিধান দ্বারা এ দুই আয়াতের হুকুম মানসূখ্ হবার প্রশ্নই ওঠে না।

আমরা এখানে কথিত নাসেখ্-মানসূখের ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হিসেবে বহুলভাবে উল্লেখকৃত তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। এভাবে, আরো কোনো আয়াতের হুকুম অন্য কোনো আয়াতে বর্ণিত হুকুমের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে হলে সেগুলো নিয়েও গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হলে দেখা যাবে সে সবের মধ্য থেকে কোনো হুকুমই মানসূখ্ হয় নি। বরং কোরআন মজীদের প্রতিটি হুকুমই স্বমহিমায় বহাল আছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে কোরআন মজীদের সকল আহকাম্ থেকে কল্যাণ লাভের তাওফীক্ব দিন। আমীন।।

[কৃতজ্ঞতা : অত্র প্রবন্ধ রচনায় আল্লামা সাইয়েদ আবুল্ ক্বাসেম খুয়ী (রহ্ঃ) রচিত البيان فى تفسير القرآن গ্রন্থের নাসেখ্-মানসূখ্ সংক্রান্ত অধ্যায় থেকে যথেষ্ট সহায়তা নেয়া হয়েছে।]

* * *

কোরআনের মু'জিযাহ্

নবী-রাসূলগণ ('আঃ)-এর নবুওয়াত্ প্রমাণের মূল দলীল ছিলো তাঁদের বিচারবুদ্ধিগ্রাহ্য অস্তিত্ব। তাঁদের আখ্লাক্ব, আচরণ ও জীবনধারা থেকে সমকালীন মানুষেরা বুঝতে পারতো যে, তাঁরা কোন মিথ্যা দাবী করতে পারেন না, অতএব, তাঁরা যখন নবুওয়াত্ দাবী করছেন তখন নিঃসন্দেহে তাঁরা নবী। এছাড়া অনেক নবীকে ('আঃ) পূর্ববর্তী নবীগণ ('আঃ) নবী হিসেবে পরিচিত করে দিয়ে গেছেন বা এমন নিদর্শনাদি সহ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যাতে আবির্ভাবকালে তাঁকে বা তাঁদেরকে নবী হিসেবে সহজেই চেনা যায়।

কিন্তু এছাড়া অনেক নবীকেই ('আঃ), বিশেষ করে পূর্ববর্তী নবী ('আঃ) সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেন নি (কালগত ব্যবধানের কারণে) এমন নবীদেরকে ('আঃ), আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক নিদর্শন ও ঘটনা (মু'জিযাহ্) দেয়া হয় যা প্রত্যক্ষ করে লোকদের মধ্যে নবীর নবী হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যয় উৎপাদন হতো। কারণ, তাঁরা এমন কাজ করতেন বা তাঁদেরকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ তা'আলা এমন ঘটনা ঘটাতেন যা সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানবিক উপায়-উপকরণের দ্বারা সম্ভবপর হতো না।

এ সব মু'জিযাহ্ সেগুলো প্রত্যক্ষকারীদের জন্যে যতোখানি প্রত্যয়উৎপাদনকারী হতো শ্রবণকারীদের জন্যে তা থেকে সমপরিমাণ প্রত্যয় উৎপাদন সম্ভব ছিলো না, কারণ, তা বর্ণনাকারীর ওপরে শ্রবণকারীর প্রত্যয়ের ওপর নির্ভর করতো। পরবর্তীকালীন শ্রোতাদের জন্য তার প্রত্যয়ের মাত্রা হয় আরো কম। অবশ্য পূর্ব থেকে মওজূদ ঐশী গ্রন্থে ঈমানের কারণে উক্ত ঐশী গ্রন্থভুক্ত বর্ণনা পাঠেও সংশ্লিষ্ট নবীর মু'জিযাহ্ সম্পর্কে প্রত্যয় সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা প্রত্যক্ষকারীর মতো হওয়া সম্ভব নয়। এ কারণেই ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য যার নবুওয়াত কার্যকর সেই শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে ঐ ধরনের বহু মু'জিযাহর পাশাপাশি একটি অবিনশ্বর মু'জিযাহ্ দেয়া হয়, তা হচ্ছে কোরআন মজীদ।

কোরআন মজীদ হচ্ছে এমন একটি মু'জিযাহ যা স্থান-কাল নির্বিশেষে সবখানে ও সব সময় প্রত্যক্ষ করা সম্ভব এবং যে মু'জিযাহ্কে বিচারবুদ্ধিগ্রাহ্য করা হয়েছে। কোরআনের মু'জিযাহ্ তার রচনাশৈলী, বাচনভঙ্গি, জ্ঞানগর্ভতা, সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ ও সংক্ষিপ্ততার মধ্যে নিহিত। এ ধরনের মধ্যম আয়তনের একটি কিতাবে এতো বিপুল সংখ্যক বিষয়ে এতো সুগভীর জ্ঞান দেয়া হয়েছে, অথচ এর সাহিত্যিক মান সর্বোচ্চে – এটা মানবিক ক্ষমতার উর্ধে। এর ভিত্তিতেই কোরআন

মজীদ তার সমমানের কোন গ্রন্থ বা নিদেন পক্ষে একটি সূরাহ্ পেশ করার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে, যে চ্যালেঞ্জ আজ পর্যন্ত কেউই গ্রহণ করতে পারে নি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মানবজাতির মধ্যে উদ্ভুত ভাষাসমূহের মধ্যে আরবী ভাষা হচ্ছে সর্বাধিক সম্ভাবনাময়।

মানুষের ভাষা হিসেবে এর সম্ভাবনাকে সীমাহীন বলে অভিহিত করা চলে না বটে, তবে সে সম্ভাবনা এতোই বেশী যে, কোনো মানুষের পক্ষে তা 'পুরোপুরি' আয়ত্ত করা ও কাজে লাগানো সম্ভব নয়; কেবল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষেই সম্ভব।

আরবী ভাষা সূক্ষ্মতম ভাব প্রকাশ ও তাৎপর্যে সূক্ষ্মতম পার্থক্য প্রকাশের জন্য সর্বাধিক উপযোগী। কেবল শব্দের বানানে পরিবর্তন করে – দু'একটি হরফ যোগ ও হারাকাত পরিবর্তন এবং বাক্যের মধ্যে শব্দের অবস্থান অগ্র-পশ্চাত করে – অর্থে এতো বেশী সংখ্যক পরিবর্তন সাধন সম্ভব যা অন্য কোনো ভাষার ক্ষেত্রে চিন্তাও করা যায় না।

আরবী ভাষার এ অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণেই আরবরা নিজেদের ভাষাকে 'আরাবী (عربى) অর্থাৎ 'প্রাঞ্জল' ভাষা বলে অভিহিত করতো এবং সে তুলনায় অনারবদের ভাষার সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা লক্ষ্য করে অনারবদের 'আজামী (عجمى) বা 'বোবা' বলে বিদ্রুপ করতো।

হযরত মুহাম্মাদ(ছ্বাঃ)-এর আবির্ভাবের যুগে আরবী ভাষা তার বিকাশের চরমতম শিখরে উপনীত হয়। ঐ সময় আরবী ভাষায় এমন সব কবিতা রচিত হয় যা আজো এ ভাষার শ্রেষ্ঠতম কবিতার আসন দখল করে আছে। ঐ সময় আরবী গদ্যও (যদিও মৌখিক) বিকাশের চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয় এবং আরবী ভাষার সূচনাকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরবী বক্তা ও বাচনশিল্পীদের আবির্ভাব ঘটে ঐ সময়ই।

বস্তুতঃ বিশ্ববাসীর ওপর আরবদের গর্ব করার মতো কেবল এই একটি বিষয়ই ছিলো। তা সত্ত্বেও আরবী বাচনশিল্পের (কবিতা ও ভাষণের) সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম নায়কগণও কোরআন মজীদের

বাচনসৌন্দর্যের কাছে অক্ষম হয়ে পড়েছিলো। তাই সমগ্র কোরআনের বিকল্প রচনা করা তো দূরের কথা, এর ছোট একটি সূরাহ্‌র সমমানসম্পন্ন সূরাহ্‌ও তারা রচনা করতে সক্ষম হয় নি। তাই স্বভাবতঃই লোকেরা কোরআন মজীদের বাণী শুনে অভিভূত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতো।

লোকেরা এভাবে কোরআনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকায় আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠতম বাচনশিল্পীগণ লোকদেরকে কোরআন শোনা থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে শেষ পর্যন্ত কোরআনকে 'জাদু' বলে অভিহিত করে। বলা বাহুল্য যে, জাদুর মন্ত্র কখনো জ্ঞানবিজ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিবিধান সম্বলিত হয় না, বরং তা হয় দুর্বোধ্য। তা সত্ত্বেও কোরআনের বাচনসৌন্দর্যের কাছে এমনকি কোরআন-বিরোধী মানুষও দলে দলে আত্মসমর্পণ করতো বিধায় তারা একে 'জাদু' বলে অভিহিত করে।

কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্‌র এ-ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, এতো জ্ঞানপূর্ণ ও উন্নত সাহিত্যিক ভাবধারা বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তার ভাষা খুবই সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল; এ গ্রন্থ মুখস্ত করা ও মনে রাখা সহজ এবং বার বার পড়লে বা শুনলেও কখনোই বিরক্তি আসে না, পড়া ও শুনার আগ্রহ হ্রাস পায় না। এছাড়া এর পঠন-পাঠন মানুষের মন-মগয ও আচরণকে প্রভাবিত করে। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য মানবরচিত কোনো গ্রন্থেই নেই।

কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্‌ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে আরবী ও ফার্সী ভাষায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ সব গ্রন্থ অধ্যয়ন করে কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্‌ সম্বন্ধে বিস্তারিত ও গভীরতর ধারণা লাভ করা যেতে পারে। [এ বিষয়ে অত্র গ্রন্থকারের *কোরআনের মু'জিযাহ্‌* শীর্ষক একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে।]

কোরআনের মু'জিযাহ্‌ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ না করলে নয়। তা হচ্ছে, সাম্প্রতিক কালে মিসরের এক ব্যক্তি দাবী করেন, তিনি

কম্পিউটারের সাহায্যে কোরআনের বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, কোরআন মজীদের বর্ণ, শব্দ, হরফে মুক্বাত্বত্বা'আত্, নামসমূহ ইত্যাদি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। অতঃপর এ নিয়ে বহির্বিশ্বে কোথাও কোথাও, বিশেষ করে বাংলাদেশে খুবই উৎসাহ সৃষ্টি হয় এবং এ নিয়ে অনেকে বইপুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করেন। অথচ বিগত চৌদ্দশ' বছরে যে সব কোরআন-বিশেষজ্ঞ কোরআনের মু'জিযাহ্ সম্বন্ধে গ্রন্থাদি রচনা করেছেন তাঁদের কেউই ১৯ সংখ্যা দ্বারা কোরআনের মু'জিযাহ্ প্রমাণের চেষ্টা করেন নি। এমনকি এ বিষয়টি ময়দানে আসার পরেও বর্তমানে যে সব দেশে ইসলামী জ্ঞানচর্চা ব্যাপক ও সুগভীর অর্থাৎ ইরান, ইরাক, লেবানন, সিরিয়া ও মিসরে এ দাবীটি গ্রহণযোগ্য হয় নি।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কথিত দাবী অনুযায়ী কোরআন মজীদের কতক বিষয় ১৯ দ্বারা বিভাজ্য হলেও সবকিছু ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়। (এ সম্বন্ধে অত্র গ্রন্থকারের অপ্রকাশিত *কোরআনের মু'জিযাহ্* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) যথাসম্ভব এ তত্ত্বের পিছনে বাহাইদের ষড়যন্ত্র ক্রিয়াশীল রয়েছে। কারণ, বাহাই ধর্মাবলম্বীরা ১৯ সংখ্যাকে পবিত্র গণ্য করে। উল্লেখ্য, বাহাই ধর্ম যথাসম্ভব যায়নবাদী ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্রের ফলে অস্তিত্বলাভ করে ঠিক যেভাবে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে কাদিয়ানী ধর্ম অস্তিত্বলাভ করে।

১৯ সংখ্যার মু'জিযাহ্ তত্ত্ব প্রবর্তনের উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই যে, মুসলমানদের একাংশ প্রথমতঃ এ তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করবে, অতঃপর তাদের মধ্যে কতক লোক কোরআনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ১৯ সংখ্যা দ্বারা পরীক্ষা করে দেখবে এবং যে সব ক্ষেত্রে ১৯ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য পাবে না সে সব ক্ষেত্রে কোরআনের বিকৃতি ঘটেছে বলে তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হবে, অতঃপর তা তাদের কাছ থেকে অন্যদের মধ্যে বিস্তারলাভ করবে। তাই এ ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক থাকা যরূরী।

কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

বলা বাহুল্য যে, কোরআন মজীদের বাচনসৌন্দর্য বা মু'জিযাহ্‌র সাথে কেবল তাদের পক্ষেই পুরোপুরি পরিচিত হওয়া সম্ভব যারা আরবী

ভাষার উন্নততম প্রকাশসৌন্দর্য (ফাছ্বাহাত্ ও বালাগ্বাত্)-এর সাথে পরিচিত। তবে যারা আরবী ভাষার ফাছ্বাহাত্ ও বালাগ্বাতের সাথে পরিচিত নন তাঁদের পক্ষেও এ কিতাবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থেকে বুঝা সম্ভব যে, এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাব। এ সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কোরআন মজীদের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী ও তার বাস্তবে পরিণত হওয়া। এখানে আমরা এরূপ কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোকপাত করবো।

এক : রোমের বিজয়

৬১৫ খৃস্টাব্দে তৎকালীন পারস্য সম্রাটের নিকট রোম সম্রাট যুদ্ধে পরাজিত হন। রোমানরা আহ্‌লে কিতাব (খৃস্টান) ও পারস্য সম্রাট অগ্নিপূজারী ছিলেন বিধায় মক্কায় কুরাইশরা তাওহীদবাদী মুসলমানদের উপহাস করতে শুরু করে। তখন কোরআন মজীদের সূরাহ্ আর-রূম্ নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দেন যে, 'খুব শীঘ্রই' 'মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে' রোমানরা বিজয়ের অধিকারী হবে (আয়াত নং ২-৩)। এরপর নয় বছরের মাথায় ৬২৪ খৃস্টাব্দে রোমান বাহিনী পারস্যভুক্ত আযারবাইজান দখল করে নেয় এবং পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত বিজয়ের ধারা অব্যাহত থাকে।

দুই : আবূ লাহাবের স্ত্রীর মৃত্যুকালীন অবস্থা

মক্কায় থাকাকালে হযরত রসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর সবচেয়ে বড় দুশমন ছিলো আবূ লাহাব। আবূ লাহাবের স্ত্রীও তাঁর দুশমন ছিলো। এমতাবস্থায় কোরআন মজীদে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, আবূ লাহাবের স্ত্রী জ্বালানী কাষ্ঠের (লাকড়ির) বোঝা বহনরত অবস্থায় গলায় খেজুর পাতার তৈরি রশির ফাঁস লেগে মারা যাবে (সূরাহ্ লাহাব : ৩-৫)। শেষ পর্যন্ত সে এভাবেই মারা যায়।

আবূ লাহাবের স্ত্রীর এভাবে মৃত্যু ঘটার সত্যতা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোরআন-বিরোধীদের পক্ষ থেকে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় নি। তারপরও কেউ যদি এর সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে চায় তো তার

সংশয় নিরসনের জন্যে এতোটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, আবূ লাহাবের স্ত্রীর মৃত্যু এভাবে না হয়ে অন্য কোনোভাবে হলে তখনকার আরবের কাফের, মোশরেক ও ইয়াহূদী-খৃস্টানরা হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর নবুওয়াতের দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে একে প্রমাণ হিসেবে পেশ করার সুযোগ মোটেই হাতছাড়া করতো না। বরং তারা রোম, পারস্য, মিসর ও আবিসিনিয়ায় পর্যন্ত তা ব্যাপকভাবে প্রচার করতো এবং এই একটি ঘটনাই ইসলামের মৃত্যু ঘটার জন্য যথেষ্ট হতো।

তিন : মক্কাহ্ বিজয়

হুদায়বীয়াহ্র সন্ধি বাহ্যিক বিচারে মুসলমানদের জন্য ছিলো অপমানজনক, এ কারণে অনেক ছ্বাহাবী এ সন্ধি সম্পাদনের বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ) আল্লাহর নির্দেশে সন্ধি করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদের সূরাহ্ আল্–ফাৎহ্ নাযিল্ করে জানিয়ে দেন যে, মুসলমানরা অচিরেই মক্কাহ্ বিজয় করতে পারবে (আয়াত নং ১ ও ২৭)। অচিরেই এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব রূপ লাভ করে। উল্লেখ্য, সূরাহ্ আল্-ক্বাছ্বাছ্বের ৮৫ নং আয়াতেও এর ইঙ্গিত রয়েছে এবং সূরাহ্ আন্-নাছ্বর্-এও একই ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

চার : ফির্'আউনের মৃতদেহ সংরক্ষণ

হযরত মূসা (আঃ)-এর পিছু ধাওয়াকারী ফির্'আউন্ তার দলবলসহ লোহিত সাগরে ডুবে মারা যায়। এ ঘটনা বাইবেলের পুরাতন নিয়মের যাত্রাপুস্তকে এবং কোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে যে, ফিরআউনের মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সম্বোধন করে বলেন :

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ.

"অতএব, আজ আমি তোমার শরীরকে রক্ষা করবো যাতে তা তোমার পরবর্তী লোকদের জন্যে একটি নিদর্শনস্বরূপ হয়, যদিও এতে

সন্দেহ নেই যে, অধিকাংশ মানুষই আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে উদাসীন থাকে।”(সূরাহ্ ইউনুস : ৯২)

বাইবেলের ‘যাত্রাপুস্তকে’ এ বিষয়ে কোনো কথা উল্লেখ নেই এবং হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর যুগে কারোই জানা ছিলো না যে, হযরত মূসা (‘আঃ)-এর সময় ডুবে মরা ফির্‘আউনের মৃতদেহ কোথাও সংরক্ষিত আছে। কোরআন মজীদের এ আয়াত নাযিল হবার তেরশ’ বছর পর উক্ত ফির্‘আউনের লাশ একটি পিরামিডের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়। (নিঃসন্দেহে তার উত্তরাধিকারীরা লাশটি সমুদ্র থেকে উদ্ধারের পর মমি করে পিরামিডে রেখেছিলো।) লাশটি এখনও কায়রোর জাদুঘরে আছে। এ লাশের ওপরকার লবণের আস্তরণ থেকে এটিকে হযরত মূসা (‘আঃ)-এর সময় ডুবে মরা ফির্‘আউনের লাশ বলে সনাক্ত করা হয়।

পাঁচ : রাসূলুল্লাহ্‌র (ছ্বাঃ) বংশধারা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর দুই পুত্র ক্বাসেম ও ‘আবদুল্লাহ্ শিশু বয়সে ইন্তেকাল করলে তাঁর দুশমন আবূ লাহাব তাঁকে আব্‌তার্’ (ابتر – লেজকাটা – ‘নির্বংশ’ অর্থে) বলে উপহাস করতো। তখন কোরআন মজীদের সূরাহ্ আল্-কাওছার্ নাযিল্ হয়। এতে আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ) কে ‘কাওছার্’ (كوثر – প্রচুর) দেয়ার কথা বলেন এবং তাঁর দুশমনকে ‘আব্‌তার্’ বলে ঘোষণা করেন। অবশ্য অনেক মুফাসসির ‘কাওছার্’ বলতে বেহেশতে নবী করীম (ছ্বাঃ) যে ‘হাউযে কাওছার্’-এর অধিকারী হবেন – এ অর্থ করেছেন। অনেক আয়াতে একাধিক ইঙ্গিত থাকে, তাই এ অর্থও গ্রহণীয়। কিন্তু কাফের শত্রুর পক্ষ থেকে ‘নির্বংশ’ বলে উপহাসের জবাব এটা হতে পারে না। তাই অনেক মুফাসসিরের মতে এর প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে এই যে, নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর বংশধরের সংখ্যা প্রচুর হবে। বাস্তবেও তা-ই দেখা যায়। হযরত ফাতেমাহ্ (সালামুল্লাহ্ ‘আলাইহা)-এর মাধ্যমে হযরত রসূলুলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর বংশধারায় সারা দুনিয়ায় যতো লোক

রয়েছেন তাঁর যুগের অন্য কোনো লোকের বংশধারায় এতো লোক আছে বলে জানা নেই। অন্যদিকে তাঁর দুশমন আবূ লাহাবের ঐ সময় সন্তানসন্ততির সংখ্যা অনেক থাকলেও — যা নিয়ে সে গর্ব করতো – অচিরেই তার বংশধারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কোরআন মজীদে বৈজ্ঞানিক তথ্য

কোরআন মজীদ যে আল্লাহ্‌র কিতাব তার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে, এতে এমন বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে যা কোরআন নাযিলের যুগের মানুষের পক্ষে জানা তো দূরের কথা, পরবর্তী প্রায় তেরশ’ বছর পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিলো এবং মোটামুটি বিগত এক শতাব্দীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সবের মধ্য থেকে কয়েকটি সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

এক : উদ্ভিদের প্রাণ

উদ্ভিদের প্রাণ আছে এ তথ্যটি বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে আবিষ্কৃত হয়। অতি সাম্প্রতিককালে এ-ও প্রমাণিত হয়েছে যে, উদ্ভিদ তার পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে সচেতন; পারিপার্শ্বিকতার সব কিছুকে ও সবাইকে চিনতে পারে এবং অন্যদের আচরণের মোকাবিলায় সাড়া দিতে পারে। অথচ এখন থেকে চৌদ্দশ’ বছর আগেই কোরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, উদ্ভিদ আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দাহ্‌ করে (সূরাহ্‌ আর্‌-রাহ্‌মান্‌ : ৬), অর্থাৎ উদ্ভিদ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন প্রাণশীল সৃষ্টি।

দুই : জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, প্রাণীকুল ও উদ্ভিদকুলের প্রতিটি প্রজাতিরই নারী-পুরুষ রয়েছে। দৃশ্যতঃ কোনো উদ্ভিদের নারী-পুরুষ না থাকলেও একই বৃক্ষে নারী ফুল ও পুরুষ ফুল ধরে অথবা একই ফুলে গর্ভকেশর ও পুংকেশর রয়েছে। এমনকি পরমাণু পর্যন্ত ধনাত্মক এ ঋণাত্মক বিদ্যুত দ্বারা গঠিত। হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর যুগে কতক উদ্ভিদের নারী-পুরুষ থাকার কথা জানা থাকলেও সকল উদ্ভিদের নারী-পুরুষ থাকার বা একই ফুলের গর্ভকেশর-পুংকেশর থাকার কথা জানা

ছিলো না, পরমাণুর দু'ধরনের বিদ্যুতের কথা জানা থাকা তো দূরের কথা। কিন্তু কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ.

"পরমপ্রমুক্ত তিনি যিনি ধরণীর বুকে গজানো সব কিছুকে এবং তাদের নিজেদেরকেও, আর তারা যে সব কিছুকে জানে না তার সব কিছুকেই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।" (সূরাহ্ ইয়া-সীন্ : ৩৬)

এখানে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, লোকেরা যে সব কিছুর জোড়া হওয়ার কথা জানতো না (বা এখনো অনেক কিছুর ব্যাপারে জানে না) তা-ও জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে।

তিন : মাতৃগর্ভে সন্তানের বিকাশপ্রক্রিয়া

মাতৃগর্ভে সন্তানের বিকাশ ও বৃদ্ধির পর্যায়ক্রম সম্বন্ধে কোরআন নাযিলের যুগের মানুষ কিছুই জানতো না। আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দেন যে, মাতৃগর্ভে শুক্র একটি জড়িত বস্তুর রূপ লাভ করে, তারপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়, এরপর তা থেকে অস্থি সৃষ্টি হয়, এরপর অস্থির ওপর মাংসের আস্তরণ তৈরী হয়, এরপর তাকে নতুন সৃষ্টিতে পরিণত করা হয় (সূরাহ্ আল্-মু'মিনূন্ : ১৪)। সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞানীরাও এ প্রক্রিয়ার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

চার : পৃথিবীর গতিশীলতা

কোরআন মজীদ নাযিলের যুগের মানুষ পৃথিবীকে স্থির মনে করত। কিন্তু কোরআন মজীদ তার গতিশীলতার কথা বলেছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا

"তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে 'সুনিয়ন্ত্রিত গতি সম্পন্ন' (ذَلُول) বানিয়েছেন, অতএব, তোমরা তার স্কন্ধসমূহে বিচরণ করো।" (সূরাহ্ আল্-মুল্ক্ : ১৫)

বাহনপশুকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ফলে তার গতি তার পিঠে আরোহণকারীর জন্য নিরাপদমূলকভাবে নিয়ন্ত্রণের উপযোগী হলে

ঐ পশুকে ‘যালূল’ অর্থাৎ ‘সুগতিসম্পন্ন’ বা ‘সুনিয়ন্ত্রিত গতি সম্পন্ন’ বলা হয়।

উক্ত আয়াতে পৃথিবীকে ‘যালূল্’ অর্থাৎ ‘সুগতিসম্পন্ন’ বা ‘সুনিয়ন্ত্রিত গতি সম্পন্ন’ বলা হয়েছে। পৃথিবীকে ‘যালূল্’ বলার মধ্যে দিয়ে তার গতিশীলতার কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তার গতি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বাসোপযোগী ভারসাম্যপূর্ণ।

পাঁচ : পরাগায়ণ ও বৃষ্টিবর্ষণে বায়ুর ভূমিকা

কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে বায়ু প্রবাহিত করার কথা বলতে গিয়ে তাকে “লাওয়াক্বেহ্” (لواقح) বলা হয়েছে (সূরাহ্ আল্-হিজ্‌র্ : ২২)। ইতিপূর্বে মুফাসসিরগণ শব্দটির অর্থ করতেন ‘গর্ভবতী’ অর্থাৎ ‘বৃষ্টিবর্ষণকারী মেঘ গর্ভে ধারণকারী বায়ু’। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শব্দটির মানে হচ্ছে ‘গর্ভসঞ্চারক’। কারণ, لواقح শব্দটি لاقح শব্দের বহুবচন। আর لاقح একটি পুরুষবাচক শব্দ, স্ত্রীবাচক হচ্ছে لاقحة এবং এ দুই শব্দের অর্থ যথাক্রমে ‘গর্ভসঞ্চারক’ ও ‘গর্ভবতী’।

ইতিপূর্বে বায়ুর গর্ভসঞ্চারক হওয়ার বিষয়টি বোধগম্য ছিলো না বলেই لواقح -এর অর্থ ‘গর্ভবতী’ করা হয়। অথচ বায়ু মেঘকে তার গর্ভে ধারণ করে না, বরং তা বায়ুর সাথে মিশে থাকে। অন্যদিকে সম্প্রতিক কালে বিজ্ঞান বায়ুর গর্ভসঞ্চারক হওয়ার বিষয়টি দুই ক্ষেত্রে প্রমাণ করেছে। প্রথমতঃ অনেক উদ্ভিদেরই পরাগায়ণ বায়ুপ্রবাহের দ্বারা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ জলীয় বাষ্প বায়ুর মধ্যে পুঞ্জিভূত হলেই বৃষ্টি হয় না, বরং বায়ুপ্রবাহের ফলে জলীয় বাষ্পের অণুগুলো পরস্পরের সংস্পর্শে এসে প্রথমে পানিবিন্দুতে ও পরে পানির ফোঁটায় পরিণত হয়, অতঃপর বৃষ্টি হয়। এখানে বায়ু মেঘের গর্ভসঞ্চারকের ভূমিকা পালন করে যার ফলে জলীয়বাষ্প গঠিত মেঘে পানির জন্ম হয়।

ছয় : পানি থেকে প্রাণের উৎপত্তি

বিজ্ঞান বলে, পানি থেকেই প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে। কোরআন মজীদ চৌদ্দশ' বছর আগেই এ কথা বলে দিয়েছে। এরশাদ হচ্ছে :

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

"আর আমি পানি থেকেই প্রতিটি জিনিসকে প্রাণশীল করেছি।" (সূরাহ্ আল্-আম্বিয়া' : ৩০)

সাত : নভোমণ্ডল গ্যাসীয় ছিল

বিজ্ঞানীদের মতে, গ্রহ-নক্ষত্রাদি সৃষ্টির পূর্বে নভোমণ্ডল গ্যাসীয় আকারে ছিলো। কোরআন মজীদে একথা চৌদ্দশ' বছর আগেই বলা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ

"অতঃপর তিনি আকাশকে সুনিয়ন্ত্রিত করলেন, আর তখন তা ছিলো ধোঁয়া (গ্যাসীয় অবস্থায়)।" (সূরাহ্ হা-মীম্ আস্-সাজ্দাহ্/ ফুছ্ছিলাত্ : ১১)

আট : আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী একত্র ছিলো

বিজ্ঞানীদের মতে, সূর্য থেকে তার গ্যাসীয় পদার্থ বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রহসমূহ সৃষ্টি হয়েছে এবং তারও পূর্বে নভোমণ্ডলের নক্ষত্রসমূহ গ্যাসীয় আকারে একত্রিত ছিল, পরে তা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, ঘন হয় ও আকার লাভ করে। কোরআন মজীদেও এ একত্র থাকার কথা বলা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

"কাফেররা কি দেখে নি যে, আসমান সমূহ ও পৃথিবী পরস্পর সংযুক্ত ছিল, অতঃপর আমি এতদুভয়কে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি?"' (সূরাহ্ আল্-আম্বিয়া' : ৩০)

কোরআন মজীদে এ ধরনের আরো বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে।

কোরআন মজীদ : কাছে থেকে জানা

কোরআন মজীদের স্বরূপের সাথে পরিচিত হতে হলে তাকে কাছে থেকে জানতে হবে। কাছে থেকে জানা মানে কোরআন মজীদের গভীরে অবগাহন করতে হবে। কোরআন মজীদ হচ্ছে সীমাহীন জ্ঞানের অতল মহাসমুদ্র। কোরআন মজীদ নিজেকে تبيانا لكل شيء (সকল কিছুর বর্ণনা/ জ্ঞান) অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানের আধার বলে দাবী করেছে। মানবজাতির জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো শাখা-প্রশাখাই এ থেকে বাদ পড়ে নি। এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে কেবল ভাষা ও বর্ণনাকৌশলের মাধ্যমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত

মানবপ্রজন্মসমূহের জন্যে সকল জ্ঞানবিজ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। জীবন ও জগতের গূঢ় রহস্য, সৃষ্টিতত্ত্ব, বস্তুগত ও অবস্তুগতজগতের রহস্যাবলী, কারণ ও ফলশ্রুতি বিধি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জোতির্বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, প্রাণিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, যুক্তিবিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, চিকিৎসাবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, আইন, দণ্ডবিধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যুদ্ধ, সন্ধি, কূটনীতি, প্রচার ও জনসংযোগ, প্রশাসন, শিক্ষা, পারিবারিক জীবন, ভবিষ্যদ্বাণী, আধ্যাত্মিকতা, অধিলোক, স্বপ্নলোক, সদৃশ জগত, পরলোক ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখাই এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতো সব শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে ব্যক্তিগত সাধনা ও অন্যদের সহায়তায় কোনো ব্যক্তিমানুষের পক্ষেই নিখুঁত ও নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। অথচ হযরত মুহম্মদ (ছ্বাঃ)-এর ন্যায় একজন নিরক্ষর ব্যক্তি এ গ্রন্থ উপস্থাপন করেছেন যার পক্ষে এ ধরনের রচনা কোনোভাবেই সম্ভব হতে পারে না। এটাই প্রমাণ করে যে, এ গ্রন্থ মহাজ্ঞানময় আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে।

কোরআন মজীদের উপর্যুপরি অধ্যয়ন থেকে নিত্য নতুন জ্ঞানভাণ্ডার বেরিয়ে আসে। অন্যদিকে, ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এ কিতাবের ভাষা ও রচনাশৈলী বিস্ময়কর যা তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ও বাগ্মীদেরকেও হতবাক করে দিয়েছিলো। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলো যে, এ কোরআন মানুষের রচিত কথা নয়। এ কোরআনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে তারা একে জাদু বলে অভিহিত করে মানুষকে এ থেকে ফিরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলো।

কোরআন মজীদের এ জ্ঞানসমুদ্র এবং সাহিত্যিক মান ও ভাষাশৈলীর সাথে পরিচিত না হওয়া পর্যন্ত কোরআনের সাথে সত্যিকার

অর্থে পরিচিত হওয়া সম্ভব নয়। কোনো ব্যক্তি যদি এমন এক পরিবেশে বড় হয় যে, সে কোনোদিন আগুন কাছে থেকে দেখে নি তাকে আগুন সম্বন্ধে যতোই বর্ণনা দেয়া হোক এবং সূর্যের তাপের সাথে যতোই তুলনা করা হোক, তার আগুন সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা হবে না। তেমনি যে একটি অতি সুমিষ্ট ফল কখনো দেখে নি ও খায় নি, তার নিকট ঐ ফলের ও তার স্বাদের যে বর্ণনাই দেয়া হোক না কেন, ঐ ফল সম্পর্কে তার যথার্থ ধারণা হবে না। ঠিক একইভাবে কোরআন মজীদকে জানতে হলে অনুবাদের মাধ্যমে নয়, মূল ভাষায় তার স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মূল ভাষায় জানা মানে কোনাভাবে আরবী পড়তে পারা বা বর্তমান যুগের আধুনিক আরবী ভাষা বুঝতে পারার যোগ্যতা নিয়ে কোরআন অধ্যয়ন নয়, বরং কোরআন মজীদ নাযিলের সময়কার ভাষাশৈলী ও শব্দাবলীর ব্যবহারিক তাৎপর্যের সাথে পরিচিত হয়ে কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে। কেবল তাহলেই কোরআনের স্বরূপের সাথে পরিচিত হওয়া যাবে। আর তখনই কোরআন পাঠক বুঝতে পারবেন যে, কেন কোরআন-বিরোধীরা একে জাদু বলে আখ্যায়িত করেছিলো। এরূপ অবস্থায় কোরআন-পাঠকের জীবন হয়ে উঠবে কোরআন কেন্দ্রিক এবং কোরআন তাঁকে এমনভাবে দুর্বার আকর্ষণে আকৃষ্ট করবে যে, তাঁর পক্ষে কোনোদিনই তা কাটানো সম্ভব হবে না, কাটিয়ে ওঠার ইচ্ছাও জাগ্রত হবে না। তখন তিনি কোরআন নিয়েই বাঁচতে চাইবেন, কোরআন নিয়েই মরতে চাইবেন। এটাই কোরআনের অবিনশ্বর মু'জিযাহ্।

প্রতিটি মুসলমানের জন্যে, বিশেষ করে আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠাকে যারা জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছেন তাঁদের জন্যে কোরআন মজীদের সঠিক পরিচিতি অর্জন অপরিহার্য।

কোরআন মজীদের সঠিক পরিচয় জানলে একদিকে যেমন কোরআনের ওপর ঈমান শক্তিশালী (محكم) হবে, অন্যদিকে

যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র পথে আহবানের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"ডাক তোমার রবের পথের দিকে অকাট্য পরমজ্ঞানের ও উত্তম সদুপদেশের সাহায্যে।" (সূরাহ্‌ আন্‌-নাহ্‌ল্‌ : ১২৫)

আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে এরূপ অভ্রান্ত ও অকাট্য পরমজ্ঞান অর্জন করা ও উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী আমলের তাওফীক্ব দিন। আমীন।

* * *

কোরআন ও নুযূলে কোরআন

[অত্র অধ্যায়টি গ্রন্থকারের অপ্রকাশিত গ্রন্থ *কোরআনের মু'জিযাহ্‌র* প্রথম অধ্যায়। কোরআন মজীদের পরিচয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় সামান্য সংশোধনী সহ এখানেও উদ্ধৃত করা হলো।]

কোরআন মজীদ আল্লাহ্‌র কিতাব্‌। কিতাব্‌ বলতে আমরা সাধারণতঃ মুদ্রিত গ্রন্থ বুঝি; অতীতে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিকেও কিতাব্‌ বলা হতো। তবে কোরআন মজীদ আল্লাহর পক্ষ থেকে কাগযে মুদ্রিত বা লিখিত গ্রন্থ আকারে আসে নি। বরং তা হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর অন্তঃকরণে নাযিল্‌ হয়েছে এবং তিনি তা তাঁর ছ্বাহাবীদের সামনে

মৌখিকভাবে পেশ করেছেন, আর সাথে সাথে, তাঁর পক্ষ হতে পূর্ব থেকে নিয়োজিত লিপিকারগণ তা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এর পর পরই তিনি সদ্য নাযিল্ হওয়া আয়াত বা সূরাহ্ পূর্বে নাযিল্কৃত সূরাহ্ ও আয়াত সমূহের মধ্যে কোথায় স্থাপন করতে হবে তা বলে দেন এবং সেভাবেই সূরাহ্ ও আয়াত সমূহ প্রতিনিয়ত বিন্যস্ত হতে থাকে।

এভাবে হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর ইন্তেকালের আগেই সমগ্র কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত হয়। অবশ্য তখন যে সব জিনিসের ওপর কোরআন লিপিবদ্ধ করা হয় তার ধরন ও আয়তন এক রকম ছিলো না। পরবর্তীকালে তৃতীয় খলীফাহ্ হযরত 'উছমানের যুগে অভিন্ন আকার ও ধরনের তৎকালে প্রাপ্ত কাগযে কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তা থেকে ব্যাপকভাবে কপি করা হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন হাদীছের ভিত্তিতে সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে এই যে, প্রথম খলীফাহ্ হযরত আবূ বকরের সময় কোরআন মজীদের সংগ্রহ ও সংকলন করা হয়। কিন্তু গবেষণামূলক বিশ্লেষণে এ ধারণা সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না। কারণ, যেহেতু কোরআন মজীদের সংকলন ও বিন্যাসের কাজ স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) সম্পাদন করে যান এবং প্রতি রামাযানে তিনি কোরআন মজীদের ঐ পর্যন্ত নাযিল্কৃত অংশ গ্রন্থাবদ্ধ ক্রম অনুযায়ী (নাযিল্-কালের ক্রম অনুযায়ী নয়) নামাযে পাঠ করতেন। এমতাবস্থায় হযরত আবূ বকরের সময় নতুন করে কোরআন মজীদের সংগ্রহ ও সংকলন করার প্রশ্নই ওঠে না। [এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।]

এ বিষয়টি এমন একটি ঐতিহাসিক বিষয় যা সকলের নিকট সুস্পষ্ট। কিন্তু কোরআন মজীদের নাযিল্ পূর্ববর্তী স্বরূপ এবং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ওপর তা নাযিলের প্রক্রিয়ার বিষয়টি যেহেতু অন্য সকলের অভিজ্ঞতার বাইরের বিষয় ও ঘটনা তাই তা একইভাবে সুস্পষ্ট নয়।

বিরাজমান ভুল ধারণা

কোরআন মজীদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে কতোগুলো ভুল ধারণা লক্ষ্য করা যায় যা দূর করার চেষ্টা খুব কমই হয়েছে। এর মধ্যে একটা ভুল ধারণা হচ্ছে লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত কোরআন মজীদের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং আরেকটি ভুল ধারণা কোরআন মজীদের নাযিল্ হবার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে। এছাড়া কোরআন মজীদ ও অন্যান্য নবী-রাসূলের (‘আঃ) ওপর নাযিল্কৃত কিতাব্ সমূহের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারেও ভুল ধারণা রয়েছে।

স্বয়ং কোরআন মজীদে (সূরাহ্ আল্-বুরূজ্ : ২১-২২) লাওহে মাহফূযে (যার আক্ষরিক মানে ‘সংরক্ষিত ফলক’) কোরআন মজীদ সংরক্ষিত থাকার কথা বলা হয়েছে। কোরআন মজীদে বস্তুজগত ও মানুষের অভিজ্ঞতা বহির্ভূত জগতের বিষয়বস্তু সম্বলিত আয়াত সমূহকে “মুতাশাবেহ্” বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ ধরনের আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দানের ও এর বিষয়বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে বস্তুজাগতিক অভিজ্ঞতার আলোকে মতামত ব্যক্ত করার সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ ধরনের আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলা ও অকাট্য জ্ঞানের অধিকারী লোকেরা ছাড়া কেউ জানে না (সূরাহ্ আালে ‘ইমরান্ : ৭)। [“মুতাশাবেহ্” (متشابه) মানে যার অন্য কিছুর সাথে মিল রয়েছে, কিন্তু হুবহু তা নয়।]

এ সত্ত্বেও সাধারণ লোকদের মধ্যে এরূপ ধারণা বিস্তার লাভ করেছে যে, নীহারিকা লোক ছাড়িয়ে আরো উর্ধে কোথাও ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কিলোমিটার দূরে “লাওহে মাহফূয্” নামক ফলক অবস্থিত এবং তাতে কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ রয়েছে। লোকেরা লাওহে মাহফূযকে বস্তুগত সৃষ্টি মনে করে থাকে। তাদের ধারণা, আমরা যে ধরনের পাথরের বা ধাতব নির্মিত ফলকের সাথে পরিচিত লাওহে মাহফূয্ তদ্রুপ কঠিন কোনো ভিন্ন ধরনের বস্তুনির্মিত ফলক। আর আমরা যেমন কালি দ্বারা লিখে থাকি, তেমনি সে লেখাও কালির লেখা, তবে হয়তো সে কালি ভিন্ন কোনো ও অত্যন্ত উন্নত মানের উপাদানে তৈরী।

ধারণা করা হয়, ফেরেশতা জিবরাঈল (‘আঃ) লাওহে মাহফূয্ থেকে কোরআন মজীদের আয়াত মুখস্থ করে এসে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর কানে কানে পড়ে যেতেন এবং তিনি তা কানে শুনে বার বার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে মুখস্থ করে এরপর সবাইকে তা পড়ে শুনাতেন।

অনুরূপভাবে আরো ধারণা করা হয় যে, অন্যান্য আসমানী কিতাব্ও অন্যত্র সংরক্ষিত রয়েছে এবং সেখান থেকে অন্যান্য নবী-রাসূলের (‘আঃ) ওপর নাযিল্ হয়েছিলো। এমনকি অনেকের মনে এমন ধারণাও রয়েছে যে, আমরা যে ধরনের বই-পুস্তকের সাথে পরিচিত আসমানী কিতাব্ সমূহ সে ধরনেরই, তবে আকারে বড় এবং সাধারণ কাগযের পরিবর্তে কোনো মূল্যবান পদার্থের দ্বারা তৈরী কাগযে লিখিত যা আমাদের পৃথিবীতে নেই এবং তার ওপরে অত্যন্ত মূল্যবান কোনো কালিতে লেখা রয়েছে।

অবশ্য হযরত মূসা (আঃ)-এর ওপর নাযিল্কৃত কিতাব তাওরাত্-এর অংশবিশেষ দশটি ফরমান লিখিত একটি ফলক আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, ট্রিলিয়িন ট্রিলিয়ন কিলোমিটার দূরে কঠিন বস্তুর ওপর তাওরাত লিখিত্ আছে এবং সেখান থেকে একটি অংশ হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে পাঠানো হয়। বরং আল্লাহর ইচ্ছায় এ ফলক তৈরী হয়েছিলো। কারণ, তিনি যখনই কোনো কিছু হোক বলে ইচ্ছা করেন সাথে সাথে তা হয়ে যায়। মূলতঃ এটা ছিলো হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুকূলে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে ঘটানো একটি মু‘জিযাহ্ ঠিক যেভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমান হতে খাবারের খাঞ্চা পাঠানো হয়েছিলো।

এছাড়া কোরআন মজীদে ‘পবিত্র পৃষ্ঠাসমূহ’-এর কথা (সূরাহ্ আল্-বাইয়্যেনাহ্ : ২) এবং কোরআনে করীমের ‘গোপন কিতাবে’ লিখিত থাকার (সূরাহ্ আল্-ওয়াক্বেয়াহ্ : ৭৭-৭৮) কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এতদুভয়ের কোনোটিই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগত পৃষ্ঠা বা গ্রন্থ হবার

ব্যাপারে কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান নেই। এরপরও যদি ধরে নেয়া হয় যে, তা হযরত মূসা (আঃ)কে প্রদত্ত ফলকসমূহের ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিছু, তাহলেও তা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সৃষ্ট লাওহে মাহফূয্-পরবর্তী পর্যায়ের সৃষ্টি, স্বয়ং লাওহে মাহফূয্ নয়।

ভুল ধারণার কারণ

এ সব ভুল ধারণার কারণ হচ্ছে, মানুষ যে বিষয়ে অভিজ্ঞতার অধিকারী নয় সে বিষয়কে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ছকে ফেলে সে সম্পর্কে ধারণা করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে মানুষকে কোনো কিছু বুঝাতে হলে তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে আশ্রয় করে বুঝানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। বলতে হয়, অমুক জিনিসটি অনেকটা এই জিনিসটির মতো। কিন্তু এ থেকে ঐ জিনিস সম্পর্কে সামান্য আবছা ধারণা লাভ করা যায় মাত্র; কখনোই পুরোপুরি সঠিক ধারণা লাভ করা যায় না।

একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি অনেকটা পরিষ্কার হতে পারে।

ইরানে এক ধরনের ফল পাওয়া যায় যার নাম হচ্ছে 'খোরমালু'। এটি দেখতে বাংলাদেশী ফল বুনো গাবের মতো। কিন্তু বুনো গাব যেখানে পাকলে হলুদ রং ধারণ করে সেখানে খোরমালু পাকলে তার রং হয় হাল্কা লাল, পাকা বুনো গাবের বীচি যেখানে খুবই শক্ত সেখানে খোরমালুর বীচি বেশ নরম এবং পাকা বুনো গাব ফল হিসেবে তেমন একটা সুস্বাদু না হলেও খোরমালু খুবই সুস্বাদু ও অত্যন্ত দামী ফল, আর বুনো গাবের বিপরীতে খোরমালু বীচি ও খোসা শুদ্ধ খাওয়া হয়; কেবল বোঁটাটাই ফেলে দিতে হয়।

এ বর্ণনা থেকে খোরমালু দেখেন নি ও খান নি এমন পাঠক-পাঠিকা কী ধারণা পেতে পারেন? মোটামুটি একটা বাহ্যিক ধারণা। কিন্তু 'খোরমালু খুবই সুস্বাদু ফল' এটা বুঝতে পারলেও এর প্রকৃত স্বাদ সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকার পক্ষে কোনোভাবেই প্রকৃত ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। অতঃপর যদি এরূপ কোনো পাঠক-পাঠিকার জন্যে বাস্তবে

খোরমালু খাবার সুযোগ আসে তখন তিনি বুঝতে পারবেন খোরমালু মানে 'অত্যন্ত সুস্বাদু নরম বীচিওয়ালা বুনো গাব' নয়, বরং এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের একটি ফল।

এভাবে কোনো শ্রোতা বা পাঠক-পাঠিকাকে তার অভিজ্ঞতা বহির্ভূত যে কোনো জিনিস বা বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিতে গেলে তার অভিজ্ঞতার আওতাভুক্ত কোনো জিনিস বা বিষয়ের সাথে তুলনা করে তাকে বুঝাতে হবে যে, জিনিসটি বা বিষয়টি মোটামুটি এ ধরনের বা এর কাছাকাছি; 'প্রকৃত' ধারণা দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এ ধরনের মোটামুটি বা কাছাকাছি ধারণা থেকে শ্রোতা বা পাঠক-পাঠিকার মধ্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। কারণ, এভাবে 'মোটামুটি বা কাছাকাছি ধারণা' পাবার পর সে তাকে নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণার ছকে ফেলে ভুলে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

মোশরেকরা যে আল্লাহ্ তা'আলাকে বস্তুগত ও শরীরী সত্তা মনে করেছে তারও কারণ এটাই। তারা শরীর ও বস্তু ছাড়া কোনো জীবনময় সত্তার কথা ভাবতেই পারে না। তারা মনে করে, সৃষ্টিকর্তাও শরীরী ও বস্তুগত সত্তা, তবে সে বস্তু অনেক উন্নত স্তরের এবং তাঁর শরীর অনেক বেশী শক্তিশালী, অবিনাশী ও অকল্পনীয় দ্রুততম গতির অধিকারী; তাই তিনি অমর অথবা অমৃত পান করার কারণে অমর হয়েছেন।

এ কারণেই দেখা যায়, মোশরেকদের কল্পিত দেবদেবীদের মূর্তিতে মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সবই রয়েছে। কারণ, তাদের মনে হয় যে, মানুষের যখন এ ধরনের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ না থাকাটা অপূর্ণতার লক্ষণ তখন সৃষ্টিকর্তার বা দেবদেবীর তা না থাকা কী করে সম্ভব? (অবশ্য মোশরেকদের অনেক দেবদেবীই হচ্ছে তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যকার বিভিন্ন পুরুষ ও নারী ব্যক্তিত্ব যাদের ওপরে তারা ঐশিতা আরোপ করেছে। কিন্তু তারা আদি সৃষ্টিকর্তার জন্যও, যেমন : হিন্দু ধর্মে ব্রহ্মার জন্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কল্পনা করে থাকে।)

এ প্রসঙ্গে একটি একটি চমৎকার বিখ্যাত উপমা রয়েছে – যা সম্ভবতঃ হযরত আলী ('আঃ) দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছে, যেহেতু

প্রতিটি প্রাণীই তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেই অপরিহার্য ও পূর্ণতার পরিচায়ক মনে করে এবং তার কোনো একটি না থাকাকে অপূর্ণতা মনে করে, সেহেতু কোনো দুই শিংওয়ালা ফড়িং-এর যদি ছবি আঁকার ক্ষমতা থাকতো এবং তাকে যদি সৃষ্টিকর্তার ছবি আঁকতে বলা হতো তাহলে অবশ্যই সে একটি ফড়িং-এর ছবি আঁকতো এবং তাতে দু'টি শিং আঁকতেও ভুলতো না। কারণ, ফড়িংটির মনে হতো, শিং-এর মতো এতো বড় যরূরী একটা অঙ্গ সৃষ্টিকর্তার না থেকেই পারে না।

বিচারবুদ্ধির রায়

তবে মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়ের জালে বন্দী নয়। কারণ, তার রয়েছে বিচারবুদ্ধি (intellect/ rationality – عقل)। আর মানুষের বিচারবুদ্ধি বস্তুবিহীন অস্তিত্ব, শরীরবিহীন জীবন, শব্দবিহীন সঙ্গীত ও বস্তুগত রং বিহীন ছবি ধারণা করতে সক্ষম।

একজন কবি বা গীতিকার কীভাবে কবিতা বা গীতি রচনা করেন? তাঁর অন্তরকর্ণে কি সুর, ছন্দ ও কথা ধ্বনিত হয় না? কিন্তু তাতে কী বায়ুতরঙ্গে সৃষ্ট শব্দের ন্যায় শব্দ আছে? তাঁর কানের কাছে বায়ুতে কি শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হয়? একজন চিত্রকর ঘরে বসে কীভাবে একটি সুন্দর দৃশ্য অঙ্কন করেন? তিনি তাঁর মনশ্চক্ষুতে শত রঙে রঙিন চমৎকার দৃশ্য দেখতে পান। কিন্তু তাতে কি বস্তু আছে? তাতে কি বস্তুগত রং আছে? নাকি তাঁর মস্তিষ্কের সংশ্লিষ্ট স্মৃতিকোষ বিশ্লেষণ করলে সেখানে ঐ রঙিন ছবির একটি অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ পাওয়া যাবে?

কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, কবি যা শোনেন এবং শিল্পী যা দেখেন তা সত্য নয়, বরং তা হচ্ছে মিথ্যা, কল্পনা; তার কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আসলে কি তাই? হ্যা, একে মিথ্যা বলা যায় যদি দাবী করা হয় যে, কবির কানের কাছে বায়ুতে শব্দতরঙ্গ তুলে এ কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছিলো এবং তা শুনে তিনি লিখেছেন, তেমনি যদি দাবী করা হয় যে, শিল্পী যা সৃষ্টি করেছেন অনুরূপ একটি মডেল তাঁর চর্মচক্ষুর

সামনে ছিলো। কিন্তু এরূপ তো দাবী করা হয় না। অতএব, তাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করা সম্ভব নয়।

কবি যা অন্তরকর্ণে শোনেন ও শিল্পী যা অন্তর্চক্ষুতে দেখেন তাকে যদি কল্পনা বলা হয়, তো বলবো, কল্পনাও এক ধরনের সত্য; অবস্তুগত সত্য, কাল্পনিক সত্য। যার অস্তিত্ব নেই তা কাউকে বা কোনো কিছুকে প্রভাবিত করতে পারে না। তবে হ্যা, এ সত্য বস্তুজাগতিক সত্য নয়; ভিন্ন মাত্রার (Dimension – بُعد) সত্য। যদিও কল্পনার অস্তিত্বসমূহ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত দুর্বল, অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী বা স্বল্পস্থায়ী হয়ে থাকে, কিন্তু অবস্তুগত অস্তিত্ব হিসেবে এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

একজনের কাছ থেকে শুনে বা প্রতীকী অক্ষরে লেখা বই-পুস্তক পড়ে কারো মধ্যে যে জ্ঞান তৈরী হয় এবং একই পন্থায় যে জ্ঞান অন্যের নিকট স্থানান্তরিত হয় তার অস্তিত্ব কারো পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব কি? কিন্তু এই জ্ঞান কি বস্তুগত অস্তিত্ব? না, বরং এ হচ্ছে ভিন্ন মাত্রার এক অবস্তুগত অস্তিত্ব।

বর্তমান যুগে কম্পিউটার-সফট্ওয়্যার্ সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা আছে। এ সফট্ওয়্যার্ কোনো বস্তুগত জিনিস নয়, বরং এক ধরনের প্রোগ্র্যাম বা বিন্যাস মাত্র। যদিও তা কম্পিউটারের মূল বস্তুগত উপাদানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাতে একটি বিশেষ বিন্যাস সৃষ্টি করে মাত্র, কিন্তু সে বিন্যাসটি কম্পিউটারের মূল উপাদান, আলোকসম্পাত ও বস্তুগত যন্ত্রপাতির ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে। এ সব সফট্ওয়্যার্-এর কপি করা হয়, এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে স্থানান্তরিত করা হয়, এগুলো বেচাকিনা হয়, শুধু তা-ই নয়, বিভিন্ন সফট্ওয়্যার্ পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই ও পরস্পরের ধ্বংস সাধন করে (যেমন : ভাইরাস্ ও এন্টি-ভাইরাস্)। এগুলো অবশ্যই এক ধরনের সৃষ্টি – এক ধরনের অস্তিত্ব, তবে অবস্তুগত অস্তিত্ব।

অস্তিত্বের প্রকারভেদ

সংক্ষেপে আমরা অস্তিত্বকে কয়েক ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমতঃ অস্তিত্ব দুই ধরনের : অপরিহার্য সত্তা বা অস্তিত্ব (Essential Existence – واجب الوجود) – যিনি এ জীবন ও জগতের অন্তরালে নিহিত মহাসত্য অনাদি, অনন্ত, অসীম, অব্যয়, অক্ষয়, চিরন্তন পরম জ্ঞানী প্রাণ। এর বিপরীতে আছে সৃষ্টিসত্তা বা সম্ভব অস্তিত্ব (Possible Existence – ممكن الوجود) – অপরিহার্য সত্তা ইচ্ছা করেছেন বলে যাদের পক্ষে অস্তিত্ব লাভ করা সম্ভবপর হয়েছে; তিনি না চাইলে তাদের পক্ষে অস্তিত্ব লাভ করা সম্ভব হতো না।

সম্ভব অস্তিত্ব হয় বস্তুগত, নয়তো অবস্তুগত, নয়তো বস্তুর আংশিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সূক্ষ্ম অস্তিত্ব। পুরোপুরি অবস্তুগত অস্তিত্ব আমাদের 'সর্বজনীন অভিজ্ঞতা'র আওতাভুক্ত নয়, কিন্তু বস্তুগত অস্তিত্ব (যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে) এবং কতক সূক্ষ্ম অস্তিত্ব, যেমন : বিদ্যুত ও চৌম্বক ক্ষেত্র আমাদের অভিজ্ঞতার আওতাভুক্ত। এছাড়া নিরেট বস্তুগত অস্তিত্বের পাশাপাশি আছে বস্তুদেহধারী প্রাণশীল অস্তিত্ব – যার বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং এর সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে মানুষ যার ভিতরে অবস্তুগত অস্তিত্ব বিচারবুদ্ধি রয়েছে – যা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই।

আমরা আমাদের বিচারবুদ্ধির দ্বারা বস্তু-উর্ধ অপরিহার্য অস্তিত্ব অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব এবং আমাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা বস্তুগত, প্রাণশীল ও সূক্ষ্ম অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। এছাড়া ধর্মীয় সূত্র থেকে আমরা অবস্তুগত ব্যক্তিসত্তা ফেরেশতাদের এবং সূক্ষ্ম উপাদানে সৃষ্ট প্রাণশীল অস্তিত্ব জ্বিনদের কথা জানতে পারি।

এ পর্যায়ে এসে প্রশ্ন জাগে, কোরআন মজীদ যে লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত রয়েছে তা কোন্ ধরনের অস্তিত্ব? তা কি বস্তুগত অস্তিত্ব, নাকি অবস্তুগত অস্তিত্ব?

আমরা লক্ষ্য করি, বস্তুগত সৃষ্টি – তা প্রাণশীলই হোক বা প্রাণহীনই হোক, সদাপরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল, তা সে ধ্বংস যতো ধীরে ধীরে এবং যতো দীর্ঘদিনেই হোক না কেন। অন্যদিকে আমরা

জানতে পারি, আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যের অধিকারী ফেরেশতারা অবস্তুগত সত্তা। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানব প্রজাতির জন্য তাঁর হেদায়াত-গ্রন্থ কোরআন মজীদকে যে লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত রেখেছেন তা ধ্বংসশীল বস্তুগত অস্তিত্ব হতে পারে না, বরং তার অবস্তুগত অস্তিত্ব হওয়া অপরিহার্য। আর যা অবস্তুগত অস্তিত্ব তাতে কালির হরফে কিছু লিপিবদ্ধ থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

কোরআনের স্বরূপ

তাহলে লাওহে মাহফূয্ নামক অবস্তুগত অস্তিত্বে কোরআন মজীদ কীভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে?

কোরআন মজীদ হচ্ছে تبيانا لكل شيء – "সকল কিছুর সুবর্ণনা (জ্ঞান)।" (সূরাহ্ আন্-নাহল্ : ৮৯)

'সকল কিছু' মানে কী? 'সকল কিছু' মানে সকল কিছুই। অর্থাৎ সৃষ্টিলোকের সূচনা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সব কিছু; যা কিছু ঘটেছে তার সব কিছুই এবং ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে যা কিছুর ঘটা অনিবার্য হয়ে আছে তার সব কিছু এবং যা কিছুর ঘটা ও না-ঘটা সমান সম্ভাবনাযুক্ত বা শর্তাধীন রয়েছে তা সেভাবেই, আর একটি অনিশ্চিত সম্ভাবনার সুবিশাল শূন্য ক্ষেত্র এতে নিহিত রয়েছে।

কোরআন মজীদ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

"আমি এ কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেই নি।" (সূরাহ্ আল্-আন্'আম্ : ৩৮)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতো কিছু লাওহে মাহফূযে কীভাবে নিহিত রয়েছে? অর্থাৎ কোন্ প্রক্রিয়ায় নিহিত রয়েছে?

এর একটাই প্রক্রিয়া হতে পারে। তা হচ্ছে, ওপরে যার উল্লেখ করা হলো তার সব কিছুই এক অবস্তুগত ত্রিমাত্রিক বাঙ্ময় চলচ্চিত্র আকারে তাতে সংরক্ষিত রয়েছে যার সকল দৃশ্য তার দর্শকের কাছে প্রতিটি মুহূর্তে সমভাবে দৃশ্যমান ও প্রতিটি বাণী সদাশ্রবণযোগ্য। শুধু বর্ণ ও শব্দ নয়, বরং স্বাদ, ঘ্রাণ ও স্পর্শযোগ্যতার বৈশিষ্ট্যও তাতে

রয়েছে যদিও তা অবস্তুগত। যার অন্তরের চোখ ও কান তা দেখার ও শোনার উপযোগী এবং অন্তরের নাসিকা, জিহ্‌বা ও ত্বক পূর্ণ মাত্রায় সক্রিয়, তাঁর কাছে তা স্বাদ, ঘ্রাণ ও স্পর্শযোগ্যতা সহ সতত শ্রুত ও দৃশ্যমান।

ঠিক একজন কবির হৃদয়ের কানে যেভাবে বায়ুতরঙ্গহীন কবিতা ধ্বনিত হয় এবং একজন শিল্পীর মানসপটে যেভাবে বস্তুগত উপাদান ছাড়াই একটি বহুরঙা সুন্দর দৃশ্য বিরাজমান, এটা তার সাথে তুলনীয়। তবে শিল্পী দুর্বল স্রষ্টা; তাঁর মনোলোকে যা অস্তিত্বলাভ করে তার স্থায়িত্ব সীমিত ও স্বল্পস্থায়ী এবং তিনি তা অন্যকে হুবহু দেখাতে অক্ষম, কিন্তু যেহেতু লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত বর্ণ, গন্ধ, শব্দ, স্বাদ, ঘ্রাণ ও স্পর্শযোগ্যতা বিশিষ্ট অবস্তুগত সৃষ্টি পরম প্রমুক্ত সত্তা কর্তৃক সৃষ্ট তাই তা এ ধরনের দুর্বলতা থেকে মুক্ত এবং তিনি যাকে তার অভিজ্ঞতা (অর্ন্তলোকীয় পঞ্চেন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা) দিতে চান তা তাঁকে দিতে পুরোপুরি সক্ষম।

বাণী এক : প্রকাশে স্তরভেদ

বিচারবুদ্ধির রায় হচ্ছে, মানুষের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার মূল বাণী স্থান-কাল-গোত্র-বর্ণ-ভাষাভেদে স্বতন্ত্র হতে পারে না। তবে ব্যক্তির প্রয়োজন ও ধারণক্ষমতা বিভিন্ন হবার কারণে এবং স্থানগত ও কালগত প্রয়োজনের বিভিন্নতার কারণে মানুষের কাছে সে বাণীর বিস্তারিত ও বাহ্যিক রূপে কিছু বিভিন্নতা হতে বাধ্য। একটি অভিন্ন দৃশ্য যখন বিভিন্ন আয়নায় প্রতিফলিত হয় তখন আয়নার গুণ, ক্ষমতা ও স্বচ্ছতার পার্থক্যের কারণে এবং দৃশ্যটি থেকে তার অবস্থানের দূরত্ব ও কৌণিকতার বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন আয়নায় প্রতিফলিত দৃশ্যে পার্থক্য দেখা যায় – যে পার্থক্য মূল দৃশ্যের বিভিন্নতা ও পার্থক্য নির্দেশ করে না, বরং তা গ্রহণকারীদের মধ্যে পার্থক্যের কারণে দৃশ্যের প্রতিফলন সমূহের মধ্যে গুণগত ও মানগত পার্থক্য মাত্র। তেমনি আয়না যদি ভগ্ন হয় তাতে দৃশ্যটি বিকৃত রূপে প্রতিফলিত হতে বাধ্য।

কিন্তু তা কোনো অবস্থাতেই মূল দৃশ্যের নিখুঁত অবস্থাকে ব্যাহত করতে সক্ষম হয় না।

একইভাবে স্থান, কাল, পরিবেশ ও ভাষাগত পার্থক্যের কারণে আল্লাহর কালাম বিভিন্ন নবী-রাসূল (‘আঃ) যেভাবে লাভ করেছেন তাতে পর্যায়গত পার্থক্য ছিলো বটে, কিন্তু তাতে কোনো পারস্পরিক বৈপরীত্য ছিলো না। যে সব ক্ষেত্রে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায় তার কারণ সে সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নবী-রাসূলগণের (‘আঃ) অবর্তমানে তাঁদের অনুসারী হবার দাবীদার লোকদের মধ্য থেকে কতক প্রভাবশালী লোক তাতে বিকৃতি সাধন করেছিলো।

সবশেষে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) যখন আবির্ভূত হলেন তখন তাঁর ব্যক্তিগত সত্তার গুণগত ও মানগত চরমোৎকর্ষ এবং তাঁর স্থান-কাল-পরিবেশ ও ভাষার পূর্ণতম উপযুক্ততার কারণে তিনি এ বাণী লাওহে মাহফূযে যেভাবে ছিলো হুবহু – কোনোরূপ হ্রাসকরণ, সংক্ষেপণ ও সঙ্কোচন ব্যতীত সেভাবেই লাভ করেন। তেমনি যারা লাওহে মাহফূযের অভিজ্ঞতার অধিকারী নয় এমন মানুষদের নিকট যতোখানি সর্বোত্তম ও বোধগম্যভাবে এ বাণী পৌঁছানো সম্ভবপর আরবী ভাষার প্রকাশক্ষমতার অনন্যতার কারণে হযরত জিবরাঈল (‘আঃ)-এর সহায়তায় ভাষার আবরণে তিনি ঠিক সেভাবেই তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হন।

আসলে লাওহে মাহফূযের স্বরূপ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে বলা আমাদের কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে কেবল এটাই সুনিশ্চিত যে, তা এক সমুন্নত অবস্তুগত অস্তিত্ব কোরআন মজীদ যাতে সংরক্ষিত। তবে অনেক ইসলাম-বিশেষজ্ঞের ধারণা, স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর হৃদয় (ক্বালব্)ই হচ্ছে লাওহে মাহফূয্। এ মত অনুযায়ী হযরত জিব্রাঈল্ (‘আঃ) আল্লাহ্ তা‘আলার কাছ থেকে ‘ইলমে হুযূরী রূপ কোরআন মজীদ নিয়ে লাওহে মাহফূয্ রূপ রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর হৃদয়ে নাযিল্ হন এবং তাতে সংরক্ষিত করে দিয়ে যান। পরে আল্লাহ্

তা‘আলার নির্দেশে ভাষার আবরণে সেখান থেকে তা ক্রমান্বয়ে মানুষের সামনে নাযিল্ হয়।

কোরআন মজীদ যেভাবে মানুষের সামনে নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর যবানে উচ্চারণ ও পঠনযোগ্য ভাষার আবরণে নাযিল্ হয় তা ছাড়াও যে ভাষাগত বর্ণনা ছাড়াই বর্ণিত সব কিছুর অবস্তুগত রূপ আকারে তথা ‘ইলমে হুযূরী আকারে তাঁর অন্তঃকরণে নাযিল্ হয়েছিলো তার প্রমাণ এই যে, তাঁর চর্মচক্ষুর সামনে সংঘটিত হয় নি কোরআন মজীদে বর্ণিত এমন ঘটনাবলীও তিনি হুবহু চর্মচক্ষুতে দেখার মতো করে তাঁর অন্তর্চক্ষুর দ্বারা দেখতে পেতেন। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)কে সম্বোধন করে এরশাদ করেন :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ.

“(হে রাসূল!) আপনি কি দেখেন নি আপনার রব হস্তি-মালিকদের সাথে কী আচরণ করেছেন?” (সূরাহ্ আল্-ফীল্ : ১)

এখানে أَلَمْ تَرَ (আপনি কি দেখেন নি) বলতে চর্মচক্ষুতে দেখার অনুরূপ দেখাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, চাক্ষুষ না দেখে শ্রবণ ও পঠন থেকে মানুষের যে জ্ঞান হয় অনুরূপ জ্ঞান বুঝানো উদ্দেশ্য হলে الم تعلم বলাই সঙ্গত হতো। অন্যদিকে আমরা জানি যে, আবরাহার হস্তিবাহিনীকে ধ্বংসের ঘটনা নবী করীম (ছ্বাঃ) চর্মচক্ষে দেখেন নি। সুতরাং এখানে যে অন্তর্চক্ষুর দ্বারা চর্মচক্ষে দেখার অনুরূপ দর্শন বুঝানো হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

দুই পর্যায়ের নাযিল্

ওপরে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) কর্তৃক ‘ইল্‌মে হুযূরী রূপ কোরআন মজীদ সরাসরি আল্লাহ্ তা‘আলার কাছ থেকে জিব্রাঈলের মাধ্যমে লাওহে মাহফূয্ রূপ স্বীয় অন্তঃকরণে লাভ করার অথবা লাওহে মাহফূয্ নামক অন্য কোনো অবস্তুগত অস্তিত্বে সংরক্ষিত কোরআন মজীদ জিব্রাঈলের মাধ্যমে স্বীয় অন্তঃকরণে লাভ করার ও সেখান থেকে যেভাবে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে দুই পর্যায়ের নাযিলের বিষয় সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। প্রথম

পর্যায়ে কোরআন মজীদ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর পবিত্র হৃদয়পটে নাযিল্ হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর হৃদয়পট থেকে মানুষের মাঝে নাযিল্ হয়।

এ থেকে আরো একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোরআন মজীদের প্রথম নাযিল্ অর্থাৎ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর পবিত্র হৃদয়পটে নাযিলের ঘটনাটি একবারে ঘটেছিলো। বস্তুতঃ বস্তুজাগতিক উপাদান ও বৈশিষ্ট্য তথা দুর্বলতা থেকে মুক্ত এ অবিভাজ্য কোরআন নাযিল্ একবারেই হওয়া সম্ভব ছিলো। আর তা নাযিল্ হয়েছিলো লাইলাতুল্ ক্বাদ্‌রে (মহিমান্বিত রজনীতে)। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

ان انزلناه فى ليلة القدر.

"নিঃসন্দেহে আমি তা (কোরআন) মহিমান্বিত রজনীতে নাযিল্ করেছি।" (সূরাহ্ আল্-ক্বাদ্‌র্ : ১)

এ আয়াতে "হু" (ه) কর্মপদ দ্বারা পুরো কোরআন নাযিলের কথাই বলা হয়েছে। তেমনি তাতে 'নাযিল্'-এর কথা বলা হয়েছে; 'নাযিল্ শুরু' করার কথা বলা হয় নি।

অন্যত্র উক্ত 'রজনী'কে 'বরকতময় রজনী' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে এবং এরশাদ হয়েছে :

حم. وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

"হা-মীম্। শপথ ঐ সুবর্ণনাকারী গ্রন্থের; নিঃসন্দেহে আমি তা বরকতময় রজনীতে নাযিল্ করেছি।" (সূরাহ্ আদ্-দুখান্ : ১-৩)

এখানেও পুরো কোরআন নাযিলের কথা বলা হয়েছে।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

"রামাযান্ মাস্ – যাতে কোরআন নাযিল্ করা হয়েছে – যা (কোরআন) মানবজাতির জন্য পথনির্দেশ (হেদায়াত্) এবং হেদায়াতের

অকাট্য প্রমাণাবলী এবং (সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে) পার্থক্যকারী (মানদণ্ড)।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ১৮৫)

এখানে লক্ষণীয় যে, রামাযান মাসে কোরআন নাযিল্ হওয়ার ঘটনাকে এ মাসের জন্য বিশেষ মর্যাদার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে মহিমান্বিত রজনীতে (লাইলাতুল্ ক্বাদ্‌র্) বা বরকতময় রজনীতেও কোরআন নাযিল্ হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রাত্রিটি রামাযান মাসেই এবং এ ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে। এ কোরআন নাযিলের কারণেই লাইলাতুল্ ক্বাদ্‌র্ হাজার রাতের চেয়েও উত্তম। সুতরাং কোরআন নাযিলের কারণে রামাযান মাসের মর্যাদার মানে এ নয় যে, এ মাসের বিভিন্ন দিনে বা রাতে কোরআন মজীদের বিভিন্ন অংশ নাযিল্ হয়েছিলো। কারণ, এভাবে কোরআন নাযিল্ অন্যান্য মাসেও হয়েছিলো। আর লাইলাতুল্ ক্বাদ্‌র্-এর এতো বড় মর্যাদার কারণ কেবল এ নয় যে, এ রাতে কোরআন নাযিল্ শুরু হয়েছিলো, বরং পুরো কোরআন নাযিলের কারণেই এ মর্যাদা।

উপরোদ্ধৃত আয়াত সমূহে কোরআন বা কোরআনের স্থলাভিষিক্ত সর্বনাম দ্বারা যে এ গ্রন্থের অংশবিশেষ তথা কতক আয়াত বা সূরাহ্ বুঝানো হয় নি, বরং পুরো কোরআনকেই বুঝানো হয়েছে তার অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে এই যে, অন্যত্র কোরআনের আয়াত ও অংশবিশেষ নাযিল্ করার কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে :

طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ.

"ত্বা-সীন্। এ হচ্ছে কোরআন ও সুবর্ণনাকারী কিতাবের আয়াত।" (সূরাহ্ আন্-নাম্‌ল্ : ১)

এখানে উদ্দিষ্ট আয়াত সমূহকে 'কোরআন' না বলে 'কোরআনের আয়াত' তথা কোরআনের অংশবিশেষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যত্রও ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে কোরআনের অংশবিশেষ নির্দেশ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا ...

"নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ কিতাব্ থেকে যা নাযিল্ করেছেন তা যারা গোপন করে এবং সামান্য মূল্যের বিনিময়ে তা বিক্রিয় করে ...।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ১৭৪)

এ আয়াত থেকেও সুস্পষ্ট যে, এতে পুরো কিতাবকে বুঝায় নি, বরং কিতাবের অংশবিশেষ বা ঐ পর্যন্ত নাযিল্কৃত অংশকে বুঝানো হয়েছে। আর এর এক আয়াত পরেই আল্লাহ্ তা'আলা শুধু "কিতাব্" বলে পুরো কোরআন মজীদকে বুঝিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে :

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

"এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ সত্যতা সহকারে কিতাব্ নাযিল্ করেছেন।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ১৭৬)

এ আয়াতে 'কিতাব্ নাযিল্ করেছেন' এবং পূর্বোদ্ধৃত আয়াতে (আল্-বাক্বারাহ্ : ১৭৪) 'কিতাব্ থেকে যা নাযিল্ করেছেন' উল্লেখ থেকেই সুস্পষ্ট যে, তাতে পুরো কোরআনকে বুঝানো হয় নি, কিন্তু শেষোক্ত আয়াতে (আল্-বাক্বারাহ্ : ১৭৬) পুরো কোরআনকে বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু আমরা জানি যে, নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর যবান থেকে লোকদের সামনে দীর্ঘ তেইশ বছর যাবত অল্প অল্প করে কোরআন মজীদ নাযিল্ হয়েছে। বিশেষ করে আমরা জানি যে, কোরআন মজীদের সর্বশেষ আয়াতগুলো নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর ইন্তেকালের মাত্র তিন মাস আগে বিদায় হজ্বের পরে নাযিল্ হয়। এমতাবস্থায় তার আগেই পুরো কোরআন-এর উল্লেখ কী করে হতে পারে? আর 'কোরআন' বলতে যদি তার অংশবিশেষকে বুঝানো হয় তো সে ক্ষেত্রে কোনো কোনো আয়াতে কোরআনের অংশের উল্লেখের মানে কী? সুতরাং সন্দেহ নেই যে, যে সব ক্ষেত্রে শুধু কোরআন বা কিতাব্ উল্লেখ

করা হয়েছে, অংশ বা আয়াত উল্লেখ করা হয় নি সে সব আয়াতে পুরো কোরআন বুঝানো হয়েছে, অথচ তা বুঝানো হয়েছে কোরআনের সর্বশেষ আয়াত নাযিলের বেশ আগে। এমতাবস্থায় এ উভয় তথ্যের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় হতে পারে?

দৃশ্যতঃ এ ধরনের কথায় স্ববিরোধিতা বা প্রকাশক্ষমতার দুর্বলতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ সম্পর্কে তৎকালীন ইসলাম-বিরোধীরা কোনো ত্রুটিনির্দেশের জন্য এগিয়ে আসে নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে (পুরো) 'কোরআন' নাযিল্ ও কোরআনের আয়াত বা অংশবিশেষ বা সূরাহ্ নাযিল্ বলতে একই ধরনের 'নাযিল্' বুঝাতো না।

কোরআন নাযিলের ধরন

পুরো কোরআন মজীদ যে, নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর বস্তুদেহের কর্ণকুহরে শব্দতরঙ্গ সৃষ্টির মাধ্যমে নাযিল্ করা হয় নি, বরং তাঁর হৃদয়পটে নাযিল্ করা হয়েছে তা-ও কোরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

و انه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الامين على قلبک لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين.

"(হে রাসূল!) নিঃসন্দেহে এটি (এ কিতাব) জগতবাসীদের রবের পক্ষ থেকে নাযিল্কৃত - যা সহ বিশ্বস্ত রূহ্ (জিবরাঈল্) আপনার অন্তঃকরণে নাযিল্ হয়েছে যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হন - সুবর্ণনাকারী প্রাঞ্জল (আরবী) ভাষায়।" (সূরাহ্ আশ্-শু'আরা : ১৯২-১৯৫)

অন্য এক আয়াতেও হযরত জিবরাঈল্ ('আঃ) যে স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর অন্তঃকরণে কোরআন পৌঁছে দিয়েছিলেন তা-ই উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

"(হে রাসূল!) আপনি বলুন : যে কেউ জিব্রীলের দুশমন হয় (সে জেনে রাখুক), নিঃসন্দেহে সে (জিব্রীল্) আল্লাহর অনুমতিক্রমেই তা

(কোরআন) আপনার অন্তঃকরণে নাযিল্ করেছে।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ৯৭)

এখানে হযরত জিবরাঈল্ ('আঃ) যে, পুরো কোরআন নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর অন্তঃকরণে পৌঁছে দিয়েছিলেন সুস্পষ্ট ভাষায় তা-ই বলা হয়েছে।

অন্যদিকে কোরআন মজীদ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর কণ্ঠ থেকে সাধারণ মানুষের মাঝে নাযিল্ হয়েছিলো অল্প অল্প করে দীর্ঘ তেইশ বছরে – এ এক অকাট্য ঐতিহাসিক সত্য যে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিতর্কের অবকাশ নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোরআন মজীদের এই প্রথম নাযিল্ অর্থাৎ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর পবিত্র হৃদয়ে একবারে সমগ্র কোরআন মজীদ নাযিলের স্বরূপ কী ছিলো?

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর মাধ্যমে যে মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর পরিপূর্ণতম বহিঃপ্রকাশ ঘটবে – এ ছিলো আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিকর্মের সূচনাপূর্ব পরিকল্পনারই অংশবিশেষ। তাই খোদায়ী পরিকল্পনার আওতায় বিশেষভাবে রক্তধারার পবিত্রতা সংরক্ষণ সহ খোদায়ী হেফাযতে এ দায়িত্ব পালনের উপযোগী হয়ে তিনি গড়ে উঠেছিলেন। তদুপরি তাঁর হৃদয়ে একবারে সমগ্র কোরআন মজীদ নাযিলের পূর্বে তাঁর হৃদয়কে প্রশস্ত (شرح صدر) করা হয়। এ প্রশস্ততা যে বস্তুদেহের হৃদপিণ্ডের প্রশস্ততা ছিলো না, বরং অন্তঃকরণের গুণগত ও মানগত প্রশস্ততা ছিলো তা বলাই বাহুল্য।

এভাবে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর হৃদয়কে গুণগত ও মানগত দিক থেকে লাওহে মাহফূযে পরিণত করা হয় অথবা লাওহে মাহফূয্ যদি স্বতন্ত্র কোনো অবস্তুগত অস্তিত্ব হয়ে থাকে তো তাঁর অন্তঃকরণকে লাওহে মাহফূযের সমপর্যায়ে উন্নীত করা হয় – যাকে আত্মিক মি'রাজ নামে অভিহিত করা চলে। তাঁর হৃদয় এ পর্যায়ে উন্নীত হবার কারণেই তা লাওহে মাহফূযে পরিণত হয় বা তার পক্ষে লাওহে

মাহফূযের ধারণক্ষমতার সমান ধারণক্ষমতার অধিকারী হওয়া এবং জিবরাঈল্ কর্তৃক সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে অথবা লাওহে মাহফূয্ নামক অন্য অবস্তুগত অস্তিত্ব থেকে নিয়ে আসা কোরআনকে কোনোরূপ হ্রাস, সঙ্কোচন ও সংক্ষেপণ ছাড়া হুবহু গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এভাবে আল্লাহর কাছ থেকে বা বর্ণিত স্বতন্ত্র লাওহে মাহফূয থেকে কোরআন মজীদ রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর লাওহে মাহফূয্ রূপ হৃদয়ে নেমে আসে বা নাযিল্ হয়।

অর্থাৎ কোরআন নাযিল্ মানে কোরআনের বস্তুগত উর্ধলোক থেকে পৃথিবীতে নেমে আসা নয়, বরং অবস্তুগত জগত থেকে বস্তুজগতের অধিবাসীর অবস্তুগত হৃদয়ে নেমে আসা; হৃদপিণ্ড নামক শরীরের বিশেষ মাংসপিণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করা নয়, বরং তাকে আশ্রয় করে অবস্থানরত অবস্তুগত হৃদয়ে প্রবেশ।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আমরা 'ইল্মে হুযূরী রূপ কোরআন মজীদের যে স্বরূপের কথা উল্লেখ করেছি, এ ধরনের কোরআনের এক বারে নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর হৃদয়ে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কিনা? যেহেতু তা ব্যাপক বিশাল ও সুদীর্ঘকালীন বস্তুজাগতিক ও অবস্তুজাগতিক সব কিছুর অবস্তুগত রূপ, সেহেতু অবস্তুগত হলেও এহেন স্থানগত ও কালগত ব্যাপকবিস্তৃত কোরআন এক বারে কী করে তাঁর হৃদয়ে নাযিল্ হওয়া সম্ভব?

এ প্রশ্নের তাত্ত্বিক জবাব হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে সেখানে অসম্ভব হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আর বিচারবুদ্ধির রায় হচ্ছে এই যে, যেহেতু বস্তুজাগতিক ও অবস্তুজাগতিক সত্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সেহেতু বস্তুজাগতিক সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতার আলোকে অবস্তুজাগতিক সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা বিচার করা সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ বস্তুজগতেও আমরা দেখতে পাই যে, যে সব অস্তিত্ব যতো স্থূল তার গতি ততো কম ও স্থানান্তরক্ষমতা ততো শ্লথ এবং যে বস্তুর স্থূলতা যতো কম বা তা যতো বেশী সূক্ষ্মতার কাছকাছি তার গতি ততো দ্রুত এবং তার স্থানান্তরক্ষমতা ততো বেশী। আমরা দেখতে পাই, কঠিন

পদার্থের তুলনায় তরল পদার্থ, তরল পদার্থের তুলনায় বায়বীয় পদার্থ ও বায়বীয় পদার্থের তুলনায় বিদ্যুত দ্রুততর গতিতে ও অপেক্ষাকৃত কম সময়ে স্থানান্তরিত হয়। চতুর্থতঃ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যে চলচ্চিত্রটি দেখতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে তা কয়েক মিনিটের মধ্যে কপি করা যায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় পুরোপুরি অবস্তুগত কোরআন মজীদ নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর হৃদয়পটে স্থানান্তরে পরিমাপযোগ্য কোনো সময় লাগা অপরিহার্য নয়।

বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল ('আঃ) হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)কে হেরা গুহায় প্রথম বার ওহী পৌঁছে দেয়ার সময় তাঁকে বুকে চেপে ধরেছিলেন। এভাবেই কি হযরত জিবরাঈল ('আঃ) পুরো অবস্তুগত কোরআন মজীদ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর হৃদয়পটরূপ লাওহে মাহফূযে স্থানান্তরিত করেছিলেন? সম্ভবতঃ তা-ই।

এ ঘটনা হেরা গুহায় সংঘটিত হয়ে থাকুক অথবা নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর গৃহে বা অন্য কোথাও, এতে সন্দেহ নেই যে, এটা লাইলাতুল্ ক্বাদ্‌র্-এ ঘটেছিলো। আর, কেবল এর পরেই জিবরাঈল্ ('আঃ) সেখানে হোক বা অন্যত্র হোক ভাষার আবরণে প্রথম আয়াতগুলো হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)কে (সম্ভবতঃ তাঁর অন্তরকর্ণে) পাঠ করে শোনান। এ আয়াতগুলো, যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সূরাহ্ আল্-'আলাক্ব-এর প্রথম পাঁচ আয়াত হতে পারে, অন্য কোনো আয়াত বা সূরাহ্ও হতে পারে। এতে কোনোই পার্থক্য নেই।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কতক খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছের বর্ণনায় যেমন বলা হয়েছে যে, প্রথম ওয়াহী নাযিলের সময় হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) বুঝতেই পারেন নি যে, তাঁকে নিয়ে কী ঘটছে অর্থাৎ তাঁকে নবী করা হয়েছে, এ কারণে তিনি ঘাবড়ে যান – এরূপ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শ্রেষ্ঠতম নবী ও রাসূলকে (ছ্বাঃ) ওয়াহী নাযিল্ করে নবুওয়াতের দায়িত্বে অভিষিক্ত করবেন অথচ নবী করীম (ছ্বাঃ) তা বুঝতেই পারবেন না বলে অস্থির ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বেন এবং এরপর তিনি একজন খৃস্টানের কাছে গিয়ে

তার কথায় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন – তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ধরনের আচরণ অকল্পনীয়। আল্লাহ্ তা'আলা অতীতের কোনো নবী-রাসূলের ('আঃ) সাথে এ ধরনের আচরণ করেন নি। সুতরাং এ ধরনের বর্ণনা – যা মুতাওয়াতির্ নয় – 'আক্বলের কাছে কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, কিছু ভ্রান্ত লোকের ধারণার বিপরীতে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর পূত চরিত্র এবং হেরা গুহায় আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবী হিসেবে মনোনীত করেন নি, বরং আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিপরিকল্পনায়ই তাঁকে নবী হিসেবে নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিলো এবং এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পূর্বপুরুষদের রক্তধারার পবিত্রতা এবং তাঁর চরিত্র ও নৈতিকতা হেফাযতের জন্য বিশেষ সুরক্ষা নিশ্চিত করেছিলেন। তাঁর আগমন আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিপরিকল্পনায় নির্ধারিত ছিলো বলেই অতীতের প্রত্যেক নবী-রাসূল ('আঃ)ই তাঁর আগমনের কথা জানতেন এবং তাঁরা তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অতএব, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) নবী হিসেবেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং জন্মসূত্রেই তাওহীদ ও আখেরাতে অকাট্য ঈমানের অধিকারী ছিলেন, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য অভিষিক্ত হবার আগে তিনি 'ঈমান'-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ও 'ওয়াহী'র স্বরূপের সাথে পরিচিত ছিলেন না।

কোরআনের ভাষাগত রূপ আল্লাহর

বিভিন্ন সূত্রের বর্ণনা অনুযায়ী, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)কে তাঁর নবুওয়াতের বিষয় আনুষ্ঠানিকভাবে অবগত করা ও নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য আদেশ আসার পূর্বেও তিনি আসমান-যমীনের নিগূঢ় সত্য অবলোকন করতেন। এর বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। অতএব, অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এ নিগূঢ় সত্যের প্রত্যক্ষকরণ তাঁর জীবনকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিলো। কিন্তু তাঁকে যখন আনুষ্ঠানিকভাবে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য অভিষিক্ত করা হলো এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের

জন্য নির্দেশ দেয়া হলো, তখন তাঁর জন্য বড় সমস্যা ছিলো এই যে, যে মহাসত্য (‘ইল্‌মে হুযূরী রূপে অবস্তুগত কোরআন মজীদ) তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করেছিলো – যা কোনো কালির হরফে লেখা কিতাব্ ছিলো না (সম্ভবতঃ এ কারণেই – লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত কিতাব্ পাঠের জন্য অক্ষরজ্ঞানের প্রয়োজন ছিলো না বিধায় আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁকে নিরক্ষর রেখেছিলেন), তা মানুষের কাছে প্রকাশ করার মতো কোনো ভাষা তাঁর জানা ছিলো না। তাই আল্লাহ্ তা‘আলার নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (‘আঃ) ভাষার আবরণে পর্যায়ক্রমে এ মহাসত্যকে তাঁর মুখে জারী করেন।

হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর মুখে এ কোরআন ভাষার আবরণে জারী হলো বটে, কিন্তু এর ভাষা তাঁর নিজের নয়। বিশেষ করে তিনি তৎকালীন আরবের কোনো কবি, সাহিত্যিক, বাগ্মী, বা অলঙ্কারবিদ্যাবিশারদ ছিলেন না; এমনকি তিনি লিখতে-পড়তেও জানতেন না। অতএব, মানুষের সকল ভাষার মধ্যে প্রকাশক্ষমতার বিচারে শ্রেষ্ঠতম ভাষা আরবী ভাষার এ শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থের ভাষা ও বক্তব্য তাঁর নিজের হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বরং এ গ্রন্থ যার পক্ষ থেকে তাঁর হৃদয়পটে নাযিল্ হয়েছিলো তথা প্রবেশ করেছিলো তিনি স্বয়ং একে সম্ভাব্য সর্বোত্তমরূপে মানুষের বোধগম্য ভাষায় পরিবর্তিত করে হযরত জিবরাঈল (‘আঃ)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর হৃদয়ে ও মন-মগযে গ্রথিত করে দেন এবং তাঁর মুখে অন্যদের নিকট প্রকাশ করেন।

কিন্তু হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর হৃদয়ে যে সত্য প্রবেশ করেছিলো এবং তিনি যে সত্য অহরহ প্রত্যক্ষ করছিলেন এভাবে মানুষের ভাষার আবরণে প্রকাশের মাধ্যমে কি সে সত্যের পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ সম্ভব ছিলো? বস্তুতঃ শ্রবণ কখনোই প্রত্যক্ষকরণের – শুধু চক্ষু দ্বারা নয়, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষকরণের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। অভিজ্ঞতার বিবরণ পাঠে কোনোদিনই অভিজ্ঞতা হাছিল্ হয় না।

তাছাড়া প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষাগত সীমাবদ্ধতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, আরবী ভাষা মানুষের ভাষাসমূহের মধ্যে

সর্বাধিক প্রকাশসম্ভাবনার অধিকারী ভাষা হলেও তা মানুষের ভাষা বৈ নয়। মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বহির্ভূত বিষয়াদির জন্যে কোনো ভাষায়ই যথোপযুক্ত শব্দাবলী ও প্রকাশকৌশল থাকতে পারে না, তা সে ভাষা যতোই না প্রায় সীমাহীন প্রকাশসম্ভাবনার অধিকারী হোক। এমতাবস্থায়, মানুষের অভিজ্ঞতা বহির্ভূত জগতের সত্যসমূহকে মানুষের অভিজ্ঞতার জগতের শব্দাবলী ও পরিভাষা সমূহ ব্যবহার করে মোটামুটি এজমালীভাবে প্রকাশ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

অতএব, সুস্পষ্ট যে, ভাষার আবরণে যে কোরআন মজীদ মানুষের কাছে উপস্থাপন করা হলো তা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর হৃদয়স্থ কোরআন মজীদের একটি পর্যায়গত ও মাত্রাগত অবতরিত রূপ বৈ নয়। এ হচ্ছে কোরআন মজীদের দ্বিতীয় দফা নাযিল্ বা মানগত অবতরণ। কোরআন মজীদের এ পর্যায়গত বা মানগত অবতরণ ঘটে সাধারণ মানুষের জন্য সম্ভাব্য সর্বোত্তম রূপে ।

নুযূলের আরো পর্যায়

কিন্তু কোরআন মজীদের নুযূল বা গুণগত অবতরণ এখানেই শেষ নয়। আমরা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এর আরো নুযূল দেখতে পাই – যা অবশ্য প্রচলিত পারিভাষিক অর্থে 'নুযূল্'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

বস্তুতঃ কোনো কিছুকেই তার স্থান, কাল ও প্রেক্ষাপট থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কোনো বক্তার বক্তব্য বিভিন্নভাবে শোনা যায়, যেমন : সরাসরি বক্তার সামনে বসে শোনা হয়, বা তার রেকর্ড বাজিয়ে শোনা যায়, বা সরাসরি শুনেছে এমন কোনো শ্রোতার কাছ থেকে হুবহু শোনা যায়, অথবা মুদ্রিত আকারে পড়া যায়। এর প্রতিটির প্রভাব শ্রোতা বা পাঠক-পাঠিকার ওপর স্বতন্ত্র। অনুরূপভাবে, বক্তা এবং তাঁর বক্তব্যের শ্রোতা বা পাঠকের মাঝে স্থানগত ও কালগত ব্যবধানও এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাবশালী। এ ক্ষেত্রে বক্তা ও লেখক থেকে শ্রোতা ও পাঠকের স্থানগত ও কালগত ব্যবধান যতো বেশী হবে

বক্তব্যের তাৎপর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ততোই মাত্রাগত অবনতি ঘটবে। অতএব, এ-ও এক ধরনের নুযূল বা অবতরণ তথা মানগত অবনয়ন বটে, যদিও ঐতিহ্যিকভাবে কোরআন বিশেষজ্ঞগণ এ জন্য "নুযূল্" পরিভাষা ব্যবহার করেন নি। তার চেয়েও বড় কথা, কোরআন মজীদের নুযূলের এ ধরনের পর্যায়সমূহ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল্কৃত পর্যায় থেকে অনেক নীচে বিধায় তা বাঞ্ছিত পর্যায় নয়। সুতরাং কোরআনকে সঠিকভাবে তথা আল্লাহ্ তা'আলার নাযিল্কৃত বাঞ্ছিত পর্যায়ে অনুধাবনের জন্য এবং সে লক্ষ্যে স্বীয় অনুধাবনক্ষমতার কাম্য পর্যায়ের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করা অপরিহার্য কর্তব্য।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো বক্তার বক্তব্যের তাৎপর্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় গ্রহণের উপায় কী? নিঃসন্দেহে এর উপায় হচ্ছে, জ্ঞানগতভাবে শ্রোতাকে বা পাঠককে স্থান, কাল, ভাষা ও পরিবেশগত ব্যবধান সমূহ অতিক্রম করে বক্তার সম্মুখে উপবিষ্ট শ্রোতার পর্যায়ে এবং গুণগতভাবে যতো বেশী সম্ভব বক্তার কাছাকাছি পর্যায়ে উন্নীত হতে হবে। এ কারণেই, সে যুগের যে সব যথোপযুক্ত ব্যক্তি কোরআন মজীদকে সরাসরি হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর কাছ থেকে শুনে অনুধাবন করেন সেভাবে বোঝার জন্য এ যুগের মানুষকে অনেক কিছু অধ্যয়ন করে জ্ঞানগত দিক থেকে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর স্থান-কালে উপনীত হতে হবে এবং সম্ভাব্য সর্বাধিক মাত্রায় বুঝতে হলে আত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক দিক থেকে যে সব ছ্বাহাবী তাঁর সর্বাধিক কাছাকাছি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন এ সব দিক থেকে শ্রোতা বা পাঠককে তাঁদের স্তরে উন্নীত হতে হবে।

অন্যদিকে কোনো অনারব ব্যক্তিকে এ পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে তাঁকে অবশ্যই তৎকালীন আরবী ভাষা-সাহিত্যের ওপর সে যুগের কবি-সাহিত্যিক-বাগ্মীদের সমপর্যায়ের দক্ষতার অধিকারী হতে হবে। কোরআন মজীদের পাঠক-পাঠিকা এ সব ক্ষেত্রে যেদিক থেকেই যতোখানি পশ্চাদপদ হবেন সেদিক থেকেই কোরআন মজীদের তাৎপর্য তাঁর নিকট পর্যায়গত দিক থেকে ততোখানি নিম্নতর মাত্রায় প্রকাশিত

হবে। এ-ও এক ধরনের নুযূল্ বা অবতরণ, তবে তা বাঞ্ছিত মাত্রা ও পর্যায়ের অবতরণ নয়।

এ ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ নীচের উদাহরণটি প্রযোজ্য হতে পারে :

অঙ্কশাস্ত্রের একজন ডক্টরেট, একজন মাস্টার ডিগ্রীধারী, একজন গ্রাজুয়েট, ... একজন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী – এদের প্রত্যেকেই অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু তাদের অঙ্কজ্ঞানের মধ্যে পর্যায়গত পার্থক্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ডক্টরেটের জ্ঞানের তুলনায় মাস্টার ডিগ্রীধারীর জ্ঞান নিম্নতর ....। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, ডক্টরেট ডিগ্রীধারী শিক্ষক তাঁর ছাত্রকে যে অঙ্কজ্ঞান দিয়েছেন – যা লাভ করে ঐ ছাত্র মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেছেন তা মাত্রাগত দিক থেকে ঐ শিক্ষকের সমপর্যায়ের অঙ্কজ্ঞান নয়, বরং পর্যায়গত দিক থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর। এভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী পর্যন্ত ক্রমেই নীচে নেমে এসেছে।

এ ব্যাপারে সম্ভবতঃ নিম্নোক্ত উপমাটি অধিকতর উপযোগী :

মানব প্রজাতির ইতিহাসের জ্ঞান বিভিন্ন স্তরের হতে পারে। কোনো ইতিহাসবিশারদের জ্ঞান পরিমাণগত দিক থেকে যতো বেশী হবে ও গুণগত দিক থেকে যতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হবে তাঁর জ্ঞান ততো উচ্চতর স্তরের এবং যার জ্ঞান পরিমাণগত দিক থেকে ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হওয়ার বিচারে যতো কম হবে তাঁর ইতিহাসজ্ঞান অপেক্ষাকৃত ততো নিম্নতর স্তরের হবে।

আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, কোনো জাতির বা সমগ্র মানব প্রজাতির ভাগ্য নির্ধারণে কেবল বড় বড় ব্যক্তিত্ব ও বড় বড় ঘটনা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, বরং একান্তই মামূলী ধরনের মানুষের দৈনন্দিন অরাজনৈতিক কাজ ও ছোট ছোট ঘটনাও ইতিহাসের বড় ধরনের গতি পরিবর্তনের কারণ হতে পারে।

শুধু মানুষের ভূমিকা নয়, ইতর প্রাণীর ভূমিকা, এমনকি জড় বস্তুর অবস্থাও এ ব্যাপারে প্রভাবশালী হতে পারে। ইতিহাসে এ ধরনের কিছু কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। পাথরে আঘাত লেগে ঘোড়ার পা

ভেঙ্গে গিয়ে সেনাপতি বা রাজার পড়ে গিয়ে শত্রুর হাতে বন্দী হওয়ার ফলে যুদ্ধের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটেছে এমন ঘটনার কথাও জানা যায়। লেডি যোশেফাইনের দুর্ব্যবহার জনিত মানসিক অশান্তি নেপোলিয়ান বোনাপার্টির যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ হয়েছিলো বলে জানা যায়। এমনকি বেশী খাওয়া বা কম খাওয়ার প্রতিক্রিয়াও যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ হতে পারে। সাম্প্রতিক কালের একটি বৈজ্ঞানিক সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ফিলিপাইনে একটি প্রজাপতির পাখা ঝাপটানোর ফলে বাংলাদেশে ঝড় হতে পারে। অতএব, কোনো সাধারণ মানুষকে, এমনকি কোনো ইতর প্রাণীকে একটি পিঁপড়ার কামড়ের প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত একটি যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণের কারণ হতে পারে। সুতরাং মানব প্রজাতির ইতিহাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে যিনি মানব প্রজাতির সূচনা থেকে শুরু করে মানুষ, প্রাণীকুল, উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের প্রতিটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী; এরূপ জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ তা‘আলারই রয়েছে।

এবার এমন একজন কাল্পনিক ইতিহাসবিদের কথা ধরা যাক যিনি হযরত আদম (‘আঃ)-এর যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বেঁচে আছেন এবং বর্তমান যুগে জ্ঞান আহরণের যে সব অত্যুন্নত উপায়-উপকরণ আছে (যেমন : কৃত্রিম উপগ্রহ, ইন্টারনেট ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি) শুরু থেকেই তিনি সে সবের অধিকারী, তাঁর ইতিহাসজ্ঞান হবে আমাদের ইতিহাসজ্ঞানের তুলনায় অকল্পনীয়রূপে বেশী। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, এরূপ ইতিহাসজ্ঞানী প্রতিটি প্রাণী ও প্রতিটি জড় পদার্থের ভিতর ও বাইরের প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিটি ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবগত নন। অতএব, মানবপ্রজাতির গোটা ইতিহাস সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা‘আলার জ্ঞানের তুলনায় তাঁর জ্ঞান হবে খুবই নিম্ন মানের, যদিও আমাদের ইতিহাসজ্ঞানের তুলনায় অকল্পনীয়ভাবে উঁচু মানের।

এখন এ ধরনের কাল্পনিক ইতিহাস বিজ্ঞানী যদি আমাদের যুগের কোনো ব্যক্তিকে তাঁর জ্ঞান দিতে চান তাহলে নিঃসন্দেহে লক্ষ লক্ষ বছরে আহরিত জ্ঞান তাঁকে হুবহু প্রদান করা সম্ভব হবে না, বরং

সংক্ষেপণ ও সঙ্কোচন করে এ জ্ঞান দিতে হবে। ধরুন একাধারে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে এই দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি অন্য কোনো কাজে সময় ব্যয় না করে কেবল প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে মানব প্রজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করলেন। সে ক্ষেত্রে তাঁর ইতিহাসজ্ঞান হবে প্রথমোক্ত ব্যক্তির তুলনায় নিম্নতর পর্যায়ের। এভাবে এ জ্ঞান পর্যায়ক্রমে সংক্ষেপণ ও সঙ্কোচন হয়ে একটি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রকে মানবপ্রজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে যে জ্ঞান দেয়া হয় তার অবস্থা চিন্তা করুন। এভাবে প্রতিটি স্তরেই একটি বিষয়ের জ্ঞান পরবর্তী স্তরে স্থানান্তরিত হতে গিয়ে পরিমাণগত, মানগত ও গুণগত দিক থেকে নীচে নেমে আসছে; একেই বলে জ্ঞানের নুযূল্ ঘটা।

কোরআন মজীদের জ্ঞান স্থানগত, কালগত ও গ্রহণকারীর মানগত দিক থেকে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) থেকে যতো দূরে এসেছে ততোই তার মান নীচে নেমেছে। এভাবে তার বিভিন্ন স্তরের অবতরণ বা নিম্নগমন (নুযূল) ঘটেছে। আর, আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, কোরআনের জ্ঞান অর্জনকারী ব্যক্তি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন জ্ঞানে এবং আত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীতে সজ্জিত হয়ে জ্ঞানগত ও মানগত দিক থেকে নিজেকে যতোই হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারবেন ততোই নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর কোরআন-জ্ঞান ও তাঁর কোরআন-জ্ঞানের মধ্যে ব্যবধান কমে আসবে। শুধু তা-ই নয়, পরবর্তীকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংযোগ হওয়ার ফলে স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর মজলিসে হাযির থেকে কোরআন শ্রবণকারীদেরও অনেকের তুলনায় ঐ ব্যক্তির কোরআন-জ্ঞান বেশী হবে। অবশ্য যারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে ইল্হামের অধিকারী হয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছেন – তা তাঁরা যে যুগেরই হোন না কেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

সাত যাহের্ ও সাত বাত্বেন্

একই প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, কোরআন বিষয়ক পণ্ডিতগণ ও মুফাসসিরগণের অনেকের অভিমত অনুযায়ী, কোরআন মজীদের সাতটি 'যাহের্' বা বাহ্যিক তাৎপর্য ও সাতটি 'বাত্বেন্' বা গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে। এর প্রথম যাহেরী তাৎপর্য হচ্ছে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর যুগে 'সর্বজনীনভাবে' কোরআন মজীদ থেকে যে তাৎপর্য গ্রহণ করা হতো তা-ই। কিন্তু কোরআন মজীদ নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলে এ থেকে আরো বহু বাহ্যিক তাৎপর্য বেরিয়ে এসেছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সে সব তাৎপর্য এমনই বিস্ময়কর যা অতীতে কল্পনাও করা যেতো না। উদাহরণ স্বরূপ, সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্র ২৬১ নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة. و الله يضاعف لمن يشاء. و الله واسع عليم.

"যারা আল্লাহর পথে তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে তাদের (এ কাজের) উপমা হচ্ছে, যেন একটি শস্যদানায় সাতটি শীষ উদগত হলো – যার প্রতিটি শীষে একশ'টি করে দানা হলো। আর আল্লাহ্ যাকে চান বহু গুণ বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ্ অসীম উদার ও সদাজ্ঞানময়।"

বলা বাহুল্য যে, এ আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয়ের শুভ প্রতিফল বর্ণনা করা হয়েছে যা আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্য (যাহের্) থেকে সুস্পষ্ট। কিন্তু একই সাথে এ আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্যেই একটি তথ্য ও একটি ভবিষ্যদ্বাণীও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তা হচ্ছে, একটি শস্যদানা থেকে সাতশ' বা তার বেশী শস্যদানা উৎপন্ন হওয়া সম্ভব এবং ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসবে যখন একটি শস্যদানা থেকে সাতশ' বা তার বেশী শস্যদানা উৎপন্ন হবে।

উক্ত আয়াত থেকে যে আমরা এরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করছি তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রাকৃতিক বিধানের আওতায় অসম্ভব এমন কিছুর উপমা দেবেন – তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, কোরআন মজীদ নাযিলের যুগের কৃষিব্যবস্থায় একটি ধান বা গম অথবা অন্য কোনো দানা জাতীয় শস্য থেকে সাতশ’ দানা উৎপন্ন হওয়ার বিষয়টি ছিলো অকল্পনীয়, কিন্তু সে যুগেও একটি ফলের বীজ থেকে গজানো গাছে শুধু এক বার নয়, বরং প্রতি বছর সাতশ’ বা তার বেশী ফলের উৎপাদন অসম্ভব ছিলো না। আরব দেশে উৎপন্ন খেজুর ছিলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমতাবস্থায় যদি উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হতো শুধু আল্লাহর পথে ব্যয়ের শুভ প্রতিফল বর্ণনা করা তাহলে এ ক্ষেত্রে ফলের বীজের উদাহরণই যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা‘আলা দানা জাতীয় শস্যের উদাহরণ দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এর পিছনে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে; হয়তো বা একাধিক বিশেষ উদ্দেশ্যও থাকতে পারে, তবে অন্ততঃ উপরোক্ত তথ্য বা ভবিষ্যদ্বাণী যে তার অন্যতম উদ্দেশ্য তাতে সন্দেহ নেই ।

অবশ্য কোরআন মজীদের নাযিলের যুগের পাঠক-পাঠিকাগণ উক্ত আয়াতের প্রথম যাহের্ বা প্রথম বাহ্যিক তাৎপর্য নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের নিকট হয়তো এটি এ আয়াতের একমাত্র বাহ্যিক তাৎপর্য বলে মনে হয়েছিলো। কিন্তু বর্তমান যুগে ধান ও গমের বহু উচ্চফলনশীল জাত আবিষ্কৃত হওয়ায় ইতিমধ্যেই একটি দানা থেকে সাতশ’ দানা বা তার বেশী উৎপন্ন হচ্ছে। ফলে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, এ আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্যে শুধু আল্লাহর পথে দানের শুভ প্রতিফলই বর্ণনা করা হয় নি, বরং একটি বাস্তবতা সম্পর্কে তথ্য ও ভবিষ্যদ্বাণীও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এভাবে কোরআন মজীদের প্রতিটি আয়াতের, প্রতিটি সূরাহ্‌র ও সামগ্রিকভাবে পুরো কোরআন মজীদের সাতটি যাহের্ বা বাহ্যিক তাৎপর্য রয়েছে বলে অনেক কোরআন-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ও মুফাসসির মনে করেন।

একইভাবে কোরআন মজীদের প্রতিটি আয়াতের, প্রতিটি সূরাহর ও সামগ্রিকভাবে পুরো কোরআন মজীদের সাতটি বাত্বেন্ বা

গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন। যেমন : সমগ্র কোরআন মজীদের অন্যতম বাত্বেন্ বা গূঢ় তাৎপর্য হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টিলোক অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে শুরু করে সমাপ্তি পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টিলোক এবং এর সকল কর্মকাণ্ড। কোরআন মজীদ তার নিজের ভাষায় تبيانا لكل شيء (সকল কিছুর সুবর্ণনা) – এ থেকে তা-ই বুঝা যায়। কারণ, كل شيء (প্রতিটি জিনিস) বলতে ছোট-বড় কোনো কিছুই বাকী থাকে না।

অবশ্য এ হচ্ছে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর সত্তায় নিহিত কোরআন মজীদের অবস্থা এবং সৃষ্টির সূচনা থেকে যা কিছু ঘটেছে ও কোরআন মজীদ নাযিল্-কালে যা কিছু অনিবার্যভাবে ও শর্তাধীনে ঘটিতব্য ছিলো তার সবই তাতে নিহিত ছিলো ও রয়েছে, আর ঘটিতব্যগুলো পরবর্তীকালে ঘটেছে ও অবশ্যই ঘটবে। এ কারণেই লাওহে মাহফূয্ তথা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর সত্তায় নিহিত কোরআন মজীদ হচ্ছে কিতাবুম্ মুবীন (সুবর্ণনাকারী গ্রন্থ)। আর আমাদের কাছে যে পঠনীয় ও শ্রবণীয় কোরআন রয়েছে তা হচ্ছে উক্ত কোরআনেরই নুযূলপ্রাপ্ত (অবতরণকৃত তথা মানগত দিক থেকে নীচে নেমে আসা) রূপ।

কোরআন মজীদের আরেক বাত্বেন হলেন স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)। কারণ, তিনি ছিলেন কোরআন মজীদের মূর্ত রূপ। "রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর জীবন কেমন ছিলো?" – এ প্রশ্নের জবাবে বলা হলো : "তোমরা কি কোরআন পড়ো নি?" এর মানে শুধু এ নয় যে, কোরআন পাঠ করলে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর চরিত্র ও জীবনধারা জানা যাবে, বরং এর মানে হচ্ছে সমগ্র কোরআন মজীদে তিনি প্রতিফলিত। ফলে যিনি কোরআন মজীদের সাথে পরিচিত হলেন তিনি স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর সাথেই পরিচিত হলেন এবং কোরআন মজীদকে যতোটুকু জানলেন স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)কে ততোটুকু জানতে পারলেন।

অবশ্য কারো যেন এরূপ ধারণা না হয় যে, হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর দৈনন্দিন পার্থিব জীবন অর্থাৎ তিনি কোনদিন কখন কী

খেলেন, কখন ঘুমালেন, কখন কোথায় গেলেন ইত্যাদি কোরআন মজীদের গভীর অধ্যয়ন থেকে বিস্তারিত ও পুরোপুরি জানা যাবে। কারণ, মানুষকে এ সব বিষয় জানানো ঐশী কালামের উদ্দেশ্য হতে পারে না, বরং নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর জীবনে ছোট-বড় এবং গ্রহণীয়-বর্জনীয় যা কিছু শিক্ষণীয় ছিলো তার সবই কোরআন মজীদ থেকে জানা যাবে। আর হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ), অন্যান্য নবী-রাসূল ('আঃ), এমনকি কাফের-মোশরেবকদের সাথে সংশ্লিষ্ট যে সব ঘটনা কোরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে সে সবের উদ্দেশ্য হচ্ছে সে সবে নিহিত শিক্ষা পৌঁছে দেয়া।

লাওহে মাহফূযে ও স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর সত্তায় নিহিত কোরআন মজীদে 'সকল কিছুর বর্ণনা' এভাবেই নিহিত রয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও কোরআন মজীদের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য এখানেই। অর্থাৎ সৃষ্টির শুরু থেকে সকল কিছু খুটিনাটি সহ সব কিছুই, প্রতিটি সৃষ্টির প্রতিটি কর্ম, এমনকি যার মধ্যে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় কিছু নেই তা সহ, আল্লাহর জ্ঞানে প্রতিফলিত। কিন্তু কোরআন মজীদে অর্থাৎ লাওহে মাহফূযে বা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর সত্তায় কেবল করণীয় ও বর্জনীয় এবং মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি-অবনতিতে প্রভাব বিস্তারক বিষয়াদির জ্ঞান ও তদসম্বলিত ঘটনাবলী নিহিত রাখা হয়েছে বলে মনে হয় (নিশ্চিত জ্ঞান স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে)।

কোরআন মজীদের গভীরতম বাত্বেন্ হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। কারণ, কোরআন মজীদের মাধ্যমে তিনি নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা নন। অতএব, তাঁর পক্ষে মানুষের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে নিজেকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বরং কেবল তাঁর গুণাবলী ও তাঁর কাজের মাধ্যমে তাঁকে জানা যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী ও কাজের সাথে যিনি যতো বেশী পরিচিত তিনি ততো বেশী মাত্রায় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সাথে পরিচিত।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর সৃষ্টি, সমগ্র সৃষ্টিলোকের সৃষ্টি ও লাওহে মাহফূযে বা নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর সত্তায় নিহিত কোরআন মজীদের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন যার নুযূলপ্রাপ্ত বা মানের অবতরণকৃত রূপ হচ্ছে পঠনীয় ও শ্রবণীয় কোরআন।

অতএব, কোরআন মজীদ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার মহান সত্তার অস্তিত্বের তাজাল্লী – তাঁর অস্তিত্বের নিদর্শন। অর্থাৎ কোরআন মজীদে যা কিছু আছে তার সব কিছু মিলে এক মহাসত্যের সাক্ষ্য বহন করছে, সে মহাসত্য হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা।

প্রসঙ্গ : শা'নে নুযূল্

আমরা উল্লেখ করেছি যে, পুরো কোরআন মজীদ প্রথমে 'ইল্‌মে হুযূরী আকারে একবারে রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর পবিত্র হৃদয়ে নাযিল্ হয়। এর পর তা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে

আল্লাহরই সৃষ্ট ভাষার আবরণে জিবরাঈল (‘আঃ) কর্তৃক দীর্ঘ তেইশ বছর যাবত বিভিন্ন উপলক্ষ্যে অল্প অল্প করে নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর কণ্ঠে লোকদের সামনে পেশ করা হয়। অবশ্য যেভাবে তা লোকদের সামনে পেশ (বা নাযিল্) করা হয় সে ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত হয় নি। বরং নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিন্যস্ত হয় – যে বিন্যাসে আমরা হস্তলিখিত বা মুদ্রিত কোরআন মজীদ দেখতে পাচ্ছি।

যে উপলক্ষ্যে কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াত ও সূরাহ সমূহ ভাষার আবরণে জনগণের মাঝে নাযিল্ হয় সে সব ঘটনা সংশ্লিষ্ট আয়াত বা সূরাহর শা’নে নুযূল্ বা নাযিলের উপলক্ষ্য হিসেবে পরিচিত। কিন্তু প্রচলিত অর্থে শা’নে নুযূল্ বলতে যা বুঝায় সে সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া অপরিহার্য।

বর্ণিত অনেক শা’নে নুযূল অর্থাৎ অনেক আয়াত ও সূরাহ্ নাযিলের উপলক্ষ্যসমূহ থেকে প্রচলিত সংজ্ঞার অনেক ছ্বাহাবীর মর্যাদা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। অবশ্য অনেক শা’নে নুযূলে বর্ণিত উপলক্ষ্যগুলো এমন যে, সেগুলো থেকে অনেক কাফের-মুশরিক ব্যক্তিত্ব ও মুনাফিক্বের অন্যায়-অপরাধ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এগুলো অবশ্য কেবল তথ্য হিসেবেই গুরুত্ব বহন করে, নচেৎ ইসলাম ও মুসলমানদের ভাগ্যের ওপরে এ সব তথ্যের তেমন একটা প্রভাব নেই। কিন্তু প্রথমোক্ত তথ্যগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের ভাগ্যের ওপরে অতীতে যেমন প্রভাব ফেলেছে তেমনি বর্তমানেও ফেলছে। তা-ই শা’নে নুযূল্ সমূহের সত্যাসত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন হচ্ছে শা‘নে নুযূলের স্বরূপ সম্বন্ধে অকাট্য ধারণা লাভ করা।

বেশীর ভাগ শা’নে নুযূলেরই তথ্যসূত্র হচ্ছে অন্ততঃ প্রথম স্তরে স্বল্পসংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হাদীছ – পারিভাষিকভাবে যেগুলোকে খবরে ওয়াহেদ্ বলা হয় – যা ইয়াক্বীন্ সৃষ্টিকারী নয়। কারণ, ইসলামী পণ্ডিতদের ভাষায়ই এ ধরনের হাদীছ অকাট্য নয় এবং এ কারণে এগুলো থেকে অকাট্য তথ্য হাছ্বিল্ হয় না, কেবল এমন ধারণা সৃষ্টি হয়

পাঠক সাধারণতঃ যাকে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত বলে মনে করে, কিন্তু তার সঠিক হওয়া নিশ্চিত নয়। অন্যদিকে এ সব হাদীছ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ওফাতের দুই শতাধিক বছর পরে সংকলিত হয় এবং এর ফলে একেকটি হাদীছের প্রথম বর্ণনাকারী অর্থাৎ প্রচলিত সংজ্ঞার ছ্বাহাবী থেকে শুরু করে সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছতে অনেকগুলো বর্ণনাকারী-স্তর অতিক্রান্ত হয়। ফলে এ সব স্তরের যে কোনোটিতেই একটি মিথ্যা হাদীছ তৈরী করে কাল্পনিকভাবে পূর্ববর্তী স্তরসমূহের সাথে সম্পৃক্ত করে দেখানো হতে পারে। স্বয়ং হাদীছ সংকলকগণ ও হাদীছ-বিশেষজ্ঞগণও এ ধরনের অসংখ্য মিথ্যা হাদীছ রচিত হবার কথা স্বীকার করেছেন এবং তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যেগুলোকে মিথ্যা বলে মনে করেছেন সেগুলোকে তাঁদের সংকলনে স্থানদান থেকে বিরত থাকেন। তবে হাদীছ সংকলকগণ যেহেতু গুনাহ্, ভুলত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে ঐশী সুরক্ষার অধিকারী ছিলেন না সেহেতু এমনকি তাঁদের অনিচ্ছা ও সাবধানতা সত্ত্বেও তাঁদের সংকলনে অনেক মিথ্যা ও বিকৃত হাদীছ অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকার সম্ভাবনা অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে বিভিন্ন সংকলকের হাদীছের মধ্যে এবং এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে একই সংকলনের মধ্যে পরস্পরবিরোধী অনেক হাদীছ দেখা যায়।

সুতরাং শা'নে নুযূল্ সংক্রান্ত হাদীছ সহ যে কোনো খবরে ওয়াহেদ হাদীছকে 'আক্বল্, কোরআন মজীদ, প্রথম থেকে প্রতি স্তরে বহুল সূত্রে বর্ণিত (মুতাওয়াতির্) হাদীছ ও প্রথম যুগ থেকে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্র অভিন্ন মতের বিষয়সমূহ – এ চার অকাট্য দ্বীনী সূত্রের মানদণ্ডে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন; এ চার সূত্রের কোনোটির সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন খবরে ওয়াহেদ হাদীছ সমূহ কেবল মুস্তাহাব ও মাকরূহর ন্যায় গৌণ বিষয়াদিতে, প্রায়োগিক বিষয়াদিতে এবং 'আক্বাএদ ও আহকাম্ বহির্ভূত 'ইল্মী বিষয়াদিতে গ্রহণযোগ্য; 'আক্বাএদের শাখা-প্রশাখা অথবা ফরয বা হারাম প্রমাণের ক্ষেত্রে এ ধরনের হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এই যে, শা'নে নুযূল সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা পোষণকারীদের বেশীর ভাগ লোকের ধারণা এই যে, যে উপলক্ষ্যে যে আয়াত বা সূরাহ্ নাযিল্ হয় ঐ উপলক্ষ্য বা ঘটনা সংঘটিত না হলে কোরআন মজীদের ঐ আয়াত বা ঐ সূরাহ্ নাযিল্ হতো না। এ ধারণার সবচেয়ে গুরুতর দিক হচ্ছে এই যে, অনেকে মনে করে যে, ইসলামের বিভিন্ন আহ্কাম যে সব উপলক্ষ্যে নাযিল্ হয়েছে বলে বলা হয় ঐ সব ঘটনা সংঘটিত না হলে ঐ সব আহ্কাম্ নাযিল্ হতো না। অথচ প্রকৃত ব্যাপার তা নয়।

উদাহরণস্বরূপ, প্রচলিত ধারণানুযায়ী মনে করা হয় যে, মদ বর্জনের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত নাযিল্ হবার আগে মদ হারাম ছিলো না এবং তার আগ পর্যন্ত অনেক ছ্বাহাবী মদ খেতেন। এ মর্মে অনেক হাদীছও বর্ণিত হয়েছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। কারণ, মদ হচ্ছে এমন জিনিস যা প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের জন্য শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও চারিত্রিক ক্ষতি বয়ে নিয়ে আসে। সুতরাং সুস্থ বিচারবুদ্ধির রায় হচ্ছে এই যে, মানব সৃষ্টির পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর বিধানে এ বস্তু হালাল থাকতে পারে না। তাছাড়া যেহেতু তাওরাতে মদ হারাম ছিলো সেহেতু রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) শরী'আতে তা প্রথম দিকে মোবাহ হিসেবে গণ্য হলে একে ইয়াহূদীরা নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর ভণ্ড নবী হওয়ার ও কোরআনের তাঁর নিজের রচিত কিতাব্ হওয়ার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতো এবং সুস্থ বিচারবুদ্ধির কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতো। ফলে ইসলামের অকাল সমাধি ঘটতো। কিন্তু কোরআন ও নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ তোলার ও প্রচার চালাবার কোনো প্রমাণ নেই।

শা'নে নুযূল সম্পর্কে প্রচলিত এ ধরনের ধারণাকে সঠিক বলে গ্রহণ করলে ধরে নিতে হয় যে, কোরআন মজীদে যেনা-ব্যভিচার থেকে নিষেধ করে আয়াত নাযিলের আগে নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর শরী'আতে যেনা-ব্যভিচার মোবাহ্ ছিলো। নিঃসন্দেহে সামান্যতম বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো মানুষও এটা মনে করতে পারে না।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কোরআন মজীদ যেহেতু লাওহে মাহ্‌ফূযে সংরক্ষিত ছিলো – তা লাওহে মাহ্‌ফূয্ স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর হৃদয়পটই হোক বা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট অন্য কোনো অবস্তুগত সৃষ্টিই হোক – সেহেতু পুরো কোরআন মজীদই শুরু থেকেই একই অবস্থায় ছিলো এবং তা 'ইল্‌মে হুযূরী আকারে নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর হৃদয়পটে প্রবেশের সময় থকেই সমস্ত বিধিবিধান তাতে একভাবেই বিদ্যমান (মাহ্‌ফূয্ – সংরক্ষিত) ছিলো। অতঃপর বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি দৃষ্টে যখন যে বিষয় সম্পর্কিত আয়াত বা সূরাহ্ মানুষের সামনে পেশ করাকে অধিকতর উপযোগী গণ্য করা হয় তখন সে আয়াত্ বা সূরাহ্ ভাষার আবরণে লোকদের সামনে নাযিল্ করা হয়।

এ বিষয়টি বর্তমানে আমরা যেভাবে কোরআন মজীদ ব্যবহার করি তদ্রুপ। অর্থাৎ একজন প্রকৃত আলেমের ঘরে কোরআন মজীদ থাকা এবং তাঁর পুরো কোরআনের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি যখন, ধরুন কোনো মসজিদের মুছুল্লীদের সামনে, কোরআনের ভিত্তিতে ওয়ায-নছ্বীহত্ করেন তখন তিনি সংশ্লিষ্ট সময়ের উপলক্ষ্য (যেমন : রোযা, হজ্ব ইত্যাদি) ও সমাজ পরিবেশে যে অবস্থা বিরাজ করছে বা যে সব ঘটনা ঘটছে সেগুলো সামনে রেখে কোরআন মজীদের এতদসংশ্লিষ্ট আয়াত বা সূরাহ্ পাঠ করে লোকদেরকে সতর্ক করেন ও শিক্ষা দান করেন; তিনি কোরআন মজীদের আয়াতসমূহ সূরাহ্ আল্-ফাতেহাহ্ থেকে শুরু করে সূরাহ্ আন্-নাস্ পর্যন্ত যেভাবে লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত আছে সে বিন্যাস অনুযায়ী লোকদের সামনে উপস্থাপন করেন না, অথচ তা সেভাবেই আছে এবং তিনি যে সব আয়াত উপস্থাপন করেন নি তা-ও যথাস্থানেই আছে। বিশেষ করে তিনি আহ্‌কাম্ সম্বলিত আয়াত্ উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে যে সব আহ্‌কাম্ লোকেরা মেনে চলছে সে সংক্রান্ত আয়াত উল্লেখ না করে যে সব আহ্‌কাম্ লঙ্ঘিত হচ্ছে সে সব উদ্ধৃত করে লোকদেরকে নছ্বীহত্ করেন।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলেও সুস্পষ্ট যে, মদ বা অপর কতক খাদ্যবস্তু হারাম হওয়ার ন্যায় যে সব আহ্‌কামের প্রাকৃতিক

মানদণ্ড আছে সেগুলো আল্লাহ্‌র শরী'আতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অভিন্ন থাকলেও অন্যান্য ধরনের বিষয়াদির ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পরিবেশের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিধান দিয়েছেন এবং কতক ক্ষেত্রে বান্দাহ্‌দের আনুগত্য পরীক্ষা করার জন্য বা কোনো গোষ্ঠীকে শাস্তি দেয়ার জন্য বিভিন্ন বিধান দিয়েছেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে এ ধরনের বিধানে পরিবর্তন সাধন করেছেন। আর সর্বশেষ গ্রন্থ কোরআন মজীদে এগুলো শুরু থেকেই এরূপ ছিলো। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামে সব সময়ই মুসলমানদের জন্য নামায ফরয ছিলো, তবে এক সময় দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তে সতর রাক্'আত্ নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয় এবং লাওহে মাহফুযস্থ কোরআন মজীদে শুরু থেকেই তা এভাবে নির্ধারিত ছিলো যে, এক সময় দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তে সতর রাক্'আত্ নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া হবে।

শা'নে নুযূল সম্বন্ধে কখনো কখনো এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, যে সব আয়াতে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির কোনো ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং পরে তা সংঘটিত হয়েছে তা কি এটাই প্রমাণ করে না যে, ঐ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারিত ছিলো?

এ বিষয়টি অবশ্য অদৃষ্টবাদ প্রসঙ্গে আলোচিত হতে পারে। তবে শা'নে নুযূল প্রসঙ্গে এ ব্যাপারে বলতে হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদ যেভাবে নাযিল্ করেছেন তথা বর্তমানে আমরা তা যেভাবে পাঠ করছি তা লাওহে মাহফূযে থাকার মানে এ নয় যে, (অনেক লোক যেমন মনে করে থাকে,) তা অনাদি কালেই এভাবে সংরক্ষিত ছিলো, বরং বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে এটাই গ্রহণযোগ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তা নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর হৃদয়ে 'ইল্‌মে হুযূরী আকারে নাযিল্ করার সময় পর্যন্ত যা কিছু আগেই সংঘটিত হয়েছিলো তা সে অবস্থায়ই এবং ঐ সময় পর্যন্তকার সামগ্রিক কার্যকারণের প্রভাবে তখন থেকে ভবিষ্যতে যা কিছু সংঘটিত হওয়া অনিবার্য তা সেভাবেই এবং যা কিছু দুই বা ততোধিক সম্ভাবনাযুক্ত তা সেভাবেই, আর ভবিষ্যতের

অনিশ্চিত সম্ভাবনার বিশাল ক্ষেত্র সেভাবেই ‘ইল্‌মে হুযূরী আকারে সংরক্ষিত হয়ে যায়।

এতদসংক্রান্ত দ্বিতীয় সংশয় এই যে, উদাহরণস্বরূপ, সূরাহ্ লাহাবে আবূ লাহাবের নামোল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে কি নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর হৃদয়ে কোরআন প্রবেশের সময়ই নিশ্চিত ছিলো যে, আবূ লাহাব ইসলামের বিরুদ্ধে দুশমনীর পথ অবলম্বন করবে এবং তার জন্য ইচ্ছা করলেও ইসলাম গ্রহণের সামান্যতম সম্ভাবনাও ছিলো না? এ প্রশ্নের দু’টি সম্ভাব্য জবাব হতে পারে। একটি হচ্ছে এই যে, কোরআন নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর হৃদয়ে নাযিল্ হবার পূর্বেই আবূ লাহাব্ নিজেকে যে পথে এগিয়ে নেয় তাতে সে স্বেচ্ছায় নিজের জন্য সত্যের পথে ফিরে আসার সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে দিয়েছিলো – ঠিক যেভাবে যে সব গাছের গোড়া কেটে ফেললে তা থেকে পুনরায় নতুন করে গাছ জন্ম নেয় সে সব গাছের মধ্য থেকে কোনো কোনোটি থেকে গজানো নতুন গাছ যখন বার বার খুব ছোট থাকতেই ভেঙ্গে ফেলা হয় এক সময় সেগুলোতে আর নতুন করে গাছ গজাবার সম্ভাবনা থাকে না। এভাবে কোনো ব্যক্তি তার নিজের আমল দ্বারা তার হেদায়াতের পথ সে নিজেই চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়ে থাকতে পারে।

দ্বিতীয় জবাবটি হচ্ছে এই যে, যেহেতু আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষকে ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সেহেতু তিনি মানুষ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় থেকেই জানেন যে, কতক মানুষ স্বেচ্ছায় আল্লাহ্ তা‘আলার নাফরমানীর পথ বেছে নেবে এবং কেউ কেউ এ কাজে তাদের নেতৃত্ব দেবে। এ ধরনের লোকদের পরিচয় সংশ্লিষ্ট গুণবৈশিষ্ট্য আকারে সংরক্ষিত ছিলো এবং কালক্রমে যথাসময়ে লোকদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত ও এতদভিত্তিক কর্মের পরিণতিতে ঐ সব গুণবৈশিষ্ট্য কোনো কোনো লোকের জন্য প্রযোজ্য হয়ে যায় এবং ‘ইল্‌মে হুযূরীতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবস্তুগত শরীরে ঐ সব গুণবৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়ে যায়। তখন থেকেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ঐ সব গুণবৈশিষ্ট্যের বাস্তব দৃষ্টান্তে পরিণত হয় এবং এ কারণে ঐ সব ব্যক্তিতে সংশ্লিষ্ট গুণবৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য হয়ে

যাবার পরে ঐ সব আয়াত নাযিলের সময় তাদের নাম-ধাম যুক্ত হয়ে যায় এবং তাদের নাম সহযোগে নবী করীম (ছাঃ)-এর যবানে জারী করা হয়। আর এ বিষয়টি কেবল কোরআন মজীদের বেলায়ই নয় সমস্ত ঐশী গ্রন্থ নাযিলের বেলায়ই এরূপ হয়ে থাকার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে।

* * *

পরিশিষ্ট:

কোরআন কারো কাছে ঋণী নয়

কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব্ – যার হেফাযতের নিশ্চয়তা স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলাই দিয়েছেন। কিন্তু কতক লোক এ সত্যটি সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে বা অবগত থাকলেও বিষয়টি যথাযথভাবে অনুধাবন না করার কারণে কোরআনের হেফাযত্ ও আমাদের কাছে পৌঁছার ব্যাপারে প্রকারান্তরে একে মানুষের কাছে ঋণী হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করছে। আর এর ফলে দ্বীন ইসলামের সঠিক অনুধাবনের পথে বড় ধরনের বাধার সৃষ্টি হচ্ছে।

এদের কথা হচ্ছে, যেহেতু কোরআন মজীদ ছ্বাহাবীদের (বহুলপ্রচলিত সংজ্ঞানুযায়ী ছ্বাহাবী) মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মসমূহের কাছে এবং এভাবে আমাদের কাছে পৌঁছেছে সেহেতু তাঁদের কারোই সমালোচনা করা যাবে না। অথচ মুসলমানরা তাঁদেরকে সমালোচনার উর্ধে গণ্য করে তাঁদের কাজকর্মের ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে রাখলেও সারা দুনিয়ার মানুষ তাঁদের কাজকর্মের সমালোচনা থেকে বিরত থাকবে না, বরং তাঁদের মধ্যে যারা ভালো কাজ করেছেন তাঁদেরকে ভালো বলবে এবং মন্দ কাজ সম্পাদনকারীদেরকে মন্দ বলবে। আর ইসলাম তো কিছু লোকের প্রকাশ্য মন্দ কাজ চাপা দেয়ার জন্য আসে নি, বরং নিরপেক্ষভাবে সত্যকে প্রকাশ করে দেয়ার জন্য এসেছে। ইসলাম ব্যক্তিদের মানদণ্ডে সতকে পরিমাপ করার পরিবর্তে সত্যের মানদণ্ডে ব্যক্তিদের পরিমাপ করার জন্য এসেছে।

ইসলামের ইতিহাস যেখানে সাক্ষ্য দেয় যে, নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর যুগের অনেক মুসলমান বড় ধরনের অনৈতিক ও অমানবিক অপরাধ করায় স্বয়ং তিনিই তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন। তেমনি কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর যুগে বহু মুনাফিক্বের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এমনকি যাদের অনেককে স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)ও মুনাফিক্ব হিসেবে চিনতে পারেন নি। এছাড়া যে সব কাফের মক্কাহ্ বিজয়ের দিনে (পরিস্থিতির চাপে পড়ে জীবন বাঁচানোর জন্য) ঈমানের ঘোষণা দিয়েছিলো আল্লাহ্ তা‘আলার

কাছে তাদের ঈমান কবূল হয় নি বলে কোরআন মজীদে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে (সূরাহ্ আস্-সাজদাহ্ : ২৮-২৯)। কিন্তু ছ্বাহাবী সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত সংজ্ঞায়, যারা কেবল মুখেই নয়, অন্তর থেকেই ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁদের আমলও ঈমান অনুযায়ী ছিলো সেই প্রকৃত ছ্বাহাবীদের সাথে সাথে উক্ত মুনাফিক্বদেরকেও ছ্বাহাবী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, পরবর্তীকালে এ প্রচলিত সংজ্ঞার ছ্বাহাবীদের মধ্যে বহু রকমের অবাঞ্ছিত ঘটনার অবতারণা হয়, এমনকি বিদ্রোহ, খলীফাহ্-হত্যা ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিবদমান পক্ষসমূহের হাজার হাজার লোক নিহত হলেও এরপরও বলা হচ্ছে যে, তাঁদের কাউকেই সমালোচনা করা যাবে না, বরং ঘাতক ও নিহত নির্বিশেষে সকলকেই নক্ষত্রতুল্য গণ্য করতে হবে। আর সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় হচ্ছে এই যে, এ ক্ষেত্রে কোরআন মজীদকেই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হচ্ছে; বলা হচ্ছে, আমরা তাঁদের মাধ্যমেই কোরআন পেয়েছি, সুতরাং তাঁদের সমালোচনা করা যাবে না অর্থাৎ তাঁদের কাজকর্ম পর্যালোচনা করে বলা যাবে না যে, অমুক ভালো ছিলেন, আর অমুক মন্দ ছিলো।

এমতাবস্থায় বিচার-বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে যে, কোরআন মজীদ সংরক্ষিত থাকার এবং আমাদের কাছে পৌঁছার ব্যাপারে প্রচলিত সংজ্ঞার ছ্বাহাবীদের কাছে ঋণী কিনা।

যদিও কোরআন মজীদের সংরক্ষিত থাকা এবং আমাদের কাছে পৌঁছার ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে ঋণী না থাকার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা যে নিজেকেই এর সংরক্ষণকারী বলে ঘোষণা করেছেন এটাই যে কোনো ঈমানদারের জন্য যথেষ্ট, তথাপি আমরা বিষয়টিকে সহজবোধ্য করার জন্য এর সর্বোচ্চ মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হওয়া ও অন্যান্য দলীল উপস্থাপন করে থাকি। কিন্তু ঘটনা যদি অন্য রকম হতো অর্থাৎ স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর যুগে যদি এমন বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ না করতেন – যেমন অনেক নবী-রাসূলের ('আঃ) অবস্থা এমন ছিলো যে, তাঁরা সারা জীবন দ্বীনের প্রচার করা সত্ত্বেও তাঁদের

কারো কারো প্রতি খুবই নগণ্য সংখ্যক লোক ঈমান এনেছিলেন – তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াতো? ধরা যাক, মাত্র দু'চারজন লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনতেন এবং এর ফলে কোরআনের বর্ণনা মুতাওয়াতির্ পর্যায়ে উপনীত না হতো তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াতো?

প্রকৃত পক্ষে এরূপ হলেও কোরআন মজীদের ঐশিতা, পূর্ণতা ও সংরক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে কোনোই পার্থক্য ঘটতো না। কারণ, কোরআন মজীদ স্বীয় গ্রহণযোগ্যতাকে মুতাওয়াতির্ হওয়ার তথা বিপুল সংখ্যক ছ্বাহাবীর মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মসমূহের কাছে পৌঁছানোর ওপর নির্ভরশীল গণ্য করে নি। বরং কোরআন হচ্ছে একটি অবিনশ্বর ও জীবন্ত মু'জিযাহ্। আর যা মু'জিযাহ্ তা স্বীয় গ্রহণযোগ্যতার জন্য কোনো মানুষের মুখাপেক্ষী নয়।

দু'চার জন কেন, মাত্র একজন লোকও যদি নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর কাছ থেকে কোরআন শুনে তা পরবর্তী প্রজন্মসমূহের কাছে পৌঁছে দিতেন তাতেও কোরআনের গ্রহণযোগ্যতায় কোনোই পার্থক্য হতো না। কারণ, কোরআন মজীদ তার গ্রহণযোগ্যতার জন্য এর সমমানসম্পন্ন কোনো গ্রন্থ, এমনকি একটি ছোট সূরাহ্ উপস্থাপনের জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে। এমতাবস্থায় যে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ব্যর্থ হয়ে এর সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হতো এবং তা-ই অ-বিশেষজ্ঞদের জন্য কোরআনের ওপর ঈমান আনার জন্য যথেষ্ট হতো। শুধু তা-ই নয়, এমনকি যদি ঈমান আনার মতো একজন লোকও না পাওয়া অবস্থায় নবী করীম ('আঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় নিতেন সে ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'আলাই এ কিতাব্ সংরক্ষণ ও মানুষের কাছে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করতেন। হয়তোবা আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় কারো সাহায্য ছাড়াই এ গ্রন্থ কোনো বস্তুতে লিপিবদ্ধ হয়ে যেতো এবং মাটির নীচে চাপা পড়ে যেতো, অতঃপর বহু বছর পরে খননকার্যের ফলে তা উদ্ধার হতো আর ঔৎসুক্যবশে তা পাঠ করতে গিয়ে পাঠক বিস্মিত হতেন এবং একই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে এর ঐশিতার প্রমাণ পেতেন। যিনি হযরত মূসা ('আঃ)-এর কাছে ফরমান-লিখিত ফলক

নাযিল্ করেছিলেন তাঁর পক্ষে কি এ ধরনের কোনো লিখিত কিতাব্ তৈরী করে মাটির নীচে সংরক্ষণ করা অসম্ভব ছিলো?

এখানে আরো একটি বিষয় কারো মাথায় উদয় হতে পারে, তা হচ্ছে, নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর ওপর যদি খুবই অল্প সংখ্যক লোক ঈমান আনতেন এবং এর ফলে কোরআন মজীদ মুতাওয়াতি্র্ পর্যায়ের গ্রন্থে উপনীত না হতো, অতঃপর যদি ঐ স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্য থেকে কেউ কেউ কোরআন মজীদকে বিকৃত করতো, আর ফলে পূর্ববর্তী কতক ঐশী গ্রন্থের ন্যায় কোরআনের একাধিক সংস্করণ থাকতো, তখন অবস্থাটা কী দাঁড়াতো?

কিন্তু এটা কোনোভাবেই সম্ভবপর হতো না। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই এ ধরনের যে কোনো সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে :

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

"আর অবশ্যই অবশ্যই এ হচ্ছে এক সুদৃঢ় (অপরিবর্তনীয়) কিতাব্: এতে কোনোই মিথ্যা যুক্ত হবে না – না বর্তমানে, না ভবিষ্যতে; এটি মহাপ্রশংসিত অকাট্য জ্ঞানময়ের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।" (হা-মীম্-আস্-সাজদাহ্/ ফুছ্বছ্বিলাত্ : ৪১-৪২)

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে গ্রন্থের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন তার ক্ষেত্রে এটা সম্ভবই নয়। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)কে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ.

"আর তিনি যদি আমার নামে (নিজ থেকে) কতক কথা বলেন তাহলে অবশ্যই আমি তাঁর ডান হাত ধরে ফেলবো (তাঁকে পাকড়াও করবো), এরপর অবশ্যই তাঁর গর্দান কেটে ফেলবো (ঘাড় মটকে দেবো/ অপমৃত্যু ঘটাবো)।" (সূরাহ্ আল্-হাকবক্বাহ্ : ৪৪-৪৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)কে ইচ্ছাকৃতভাবে কোরআনে বিকৃতিসাধনের কোনো সুযোগ দেয়া হতো না। কারণ, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্যই ভণ্ডুল হয়ে যেতো। ঠিক একই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোনো ব্যক্তিকেও কোরআন বিকৃতকরণের সুযোগ দিতেন না, বরং বিষয়টি প্রাকৃতিক কারণ বিধি ও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ওপর ছেড়ে না দিয়ে প্রয়োজনবোধে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে তাঁর কিতাবের বিকৃতি রোধ করতেন।

কোরআন মজীদকে মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে আমরা উপরোক্ত যে সম্ভাব্য পন্থাসমূহের কথা বলেছি এ ছাড়াও আরেকটি সম্ভাব্য পন্থা হতে পারতো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অন্য কোনো জনগোষ্ঠীকে কোরআনকে গ্রহণ করে নেয়া ও বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। আর এটা স্বয়ং আল্লাহ্ই বলেছেন; এরশাদ করেছেন :

فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ

"অতঃপর তারা (যাদেরকে আমি কিতাব্, পরম জ্ঞান ও নবী দিয়েছি) যদি একে (কোরআনকে) প্রত্যাখ্যান করে (কাফের হয়ে যায়) তাহলে আমি তা এমন এক গোষ্ঠীর ওপর অর্পণ করবো যারা একে প্রত্যাখ্যান করবে না।" (সূরাহ্ আল্-আন্'আম্ : ৮৯)

[অবশ্য এ আয়াতের সম্প্রসারিত প্রয়োগ এ-ও বটে যে, যে জাতির মধ্যে কোরআন মজীদ নাযিল হয়েছে তারা যদি কোরআনের কার্যকর চর্চা না করে অন্যান্য জ্ঞানসূত্রকে কোরআনের ওপর অগ্রাধিকার দেয় অথবা কার্যতঃ কোরআনের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন না করে – যে অবস্থার কারণে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) শেষ বিচারের দিনে তাদের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করবেন : يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا – "হে আমার রব্! অবশ্যই আমার লোকেরা এ কোরআনকে পরিত্যক্ত করে রেখেছিলো।" (সূরাহ্ আল্-ফুরক্বান্ : ৩০) – তখন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোনো জনগোষ্ঠীকে কোরআন মজীদের

কার্যকর চর্চা ও একে অন্য সমস্ত জ্ঞানসূত্রের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ এবং এর যথাযথ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করে দেবেন।]

অতএব, অমুক ব্যক্তিরা না হলে কোরআন আমাদের কাছে পৌঁছতো না এবং আমরা মুসলমান হতাম না – এ ধরনের ভ্রান্ত যুক্তি কোরআন মজীদের সঠিক পরিচয় না জানার এবং আল্লাহ্ তা'আলার অঙ্গীকারের ওপর ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বলতার পরিচায়ক।

অবশ্য প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা ও গভীর বোধের অধিকারী নয় এমন দুর্বল ঈমানের লোক স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর সময়ও ছিলো। তারা এমন ভাব দেখাতো যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর বিরাট উপকার করেছে, না করলে ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হতো; হয়তো কাফেরদের হাতে পর্যুদস্ত হতো। অথচ প্রকৃত ব্যাপার ছিলো এই যে, ইসলাম তাদের কাছে ঋণী ছিলো না, বরং তারাই ইসলামের কাছে ঋণী ছিলো। অবশ্য এরা মুনাফিক্ব ছিলো না, তবে এদের ঈমান ছিলো দুর্বল ও অগভীর। আল্লাহ্ তা'আলা এদের সম্পর্কে এরশাদ করেন :

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ

"(হে রাসূল!) তারা ইসলাম গ্রহণ করে আপনাকে ধন্য করেছে বলে ভাব দেখায় (বা খোঁটা দেয়); আপনি (তাদেরকে) বলুন : তোমরা তোমাদের ইসলাম গ্রহণের দ্বারা আমাকে ধন্য করার ভাব দেখিয়ো না (খোঁটা দিয়ো না), বরং আল্লাহ্ই তোমাদেরকে ঈমানের দিকে পথ দেখিয়ে দিয়ে (বা এ পথে পরিচালিত করে) তোমাদেরকে ধন্য করেছেন।" (সূরাহ্ আল্-হুজুরাত্ : ১৭)

ইসলামের ইতিহাসের এক চরম দুর্যোগপূর্ণ অধ্যায়ে একজন সত্য পথানুসারী খলীফাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী একদল লোক যুদ্ধে তাদের আসন্ন পরাজয় রোধ করার ও জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে কোরআন মজীদকে বর্শার ডগায় ঝুলিয়ে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলো এবং একদল অগভীর ঈমানের লোক এতে বিচলিত হয়ে সত্য পথানুসারী

খলীফাহ্‌র ওপরে চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে নিশ্চিত বিজয়ের মুখে যুদ্ধবিরতি করতে বাধ্য করেছিলো – যার বিষময় পরিণতি আজো সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌ ভোগ করে চলেছে। আমরা যেন একইভাবে, ছ্বাহাবী হওয়ার দাবীদার মুনাফিক্ব ও দুর্বল ঈমানদারদেরকে সমালোচনা থেকে বাঁচাবার জন্য কোরআন মজীদ পৌঁছে দেয়ার ভ্রমাত্মক যুক্তিতে প্রকৃত ছ্বাহাবীদের প্রতি অন্যায় না করি এবং স্বয়ং কোরআন মজীদের মর্যাদাকে নীচে নামিয়ে না আনি। আমীন।

* * *

সহায়ক তথ্যসূত্র :

١. القرآن الكريم.
٢. تاريخ قرآن : دكتر محمدراميار، مؤسسه انتشارات امير كبير، تهران، ١٣٦٢ هـ.ش.
٣. بيان در علوم و مسائل كلى قرآن : آيت الله العظمى آقاى حاج سيد ابو القاسم خوئى، ترجمه : محمد صادق نجمى و هاشم هريسى، مجمع ذخائر اسلامى، ١٣٦٠ هـ.ش.
٤. بديع القرآن : ابن ابى الاصبح المصرى، مترجم : دكتر سيد على ميرلوحى، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، مشهد، ١ ٣٦٨ هـ.ش.
٥. تبعيين اللغات لتبيان الآيات يا فرهنگ لغات قرآن : دكتر محمد قريب، انتشارات بنياد، تهران، ١٣٦٦ هـ.ش.
٦. عصمة الانبياء فى القرآن الكريم : استاد جعفر سبحانى، دائرة العلاقات الدولية، وزارت الثقافة و الارشاد الاسلامى، تهران، ١٤٠٩ هـ. ش.
٧. علم الحديث و دراية الحديث : كاظم مدير شانچى، دفتر انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ١٣٥٤ هـ.ش.
৮. The Gospel of Barnabas : Edited and Translated from the Italian Manuscript in the Imperial Library at Vienna by Lonsdale and Laura Ragg.
৯. পবিত্র কোরআনুল করীম : (মুফতী মুহাম্মাদ শফী লিখিত তাফসীর মা'আরেফুল্ কোরআন-এর সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ), অনুবাদক : মওলানা মুহিউদ্দিন খান, খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ্ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিঃ।
১০. তরজমা-এ কুরআন মজীদ [মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ্ঃ) প্রণীত তাফসীর তাফহীমুল কোরআন-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ-এর বঙ্গানুবাদ], মূল অনুবাদ : হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ্ঃ) এবং টীকা অনুবাদ : মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম খাঁ ও নিযামুদ্দীন মোল্লা, প্রকাশনায় ফালাহ্-ই-'আম ট্রাস্ট, ঢাকা, ১৯৮২।

১১. ধর্ম্মপুস্তক – পুরাতন ও নতুন নিয়ম : ব্রিটিশ ও ফরেণ বাইবেল সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৫০।
১২. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নবুওয়াতের ধারা : আল্লামা সাইয়েদ মুজতাবা মুসাভী লারী, অনুবাদ : মুন্সী মোহাম্মাদ রফিকুল হাসান, ডন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০২।
১৩. বাইবেলে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) : আল্লামা মোহাম্মাদ সাদেকী, অনুবাদ : নূর হোসেন মজিদী, নাকীব পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৮।